বাংলাপিডিএফ.নেট

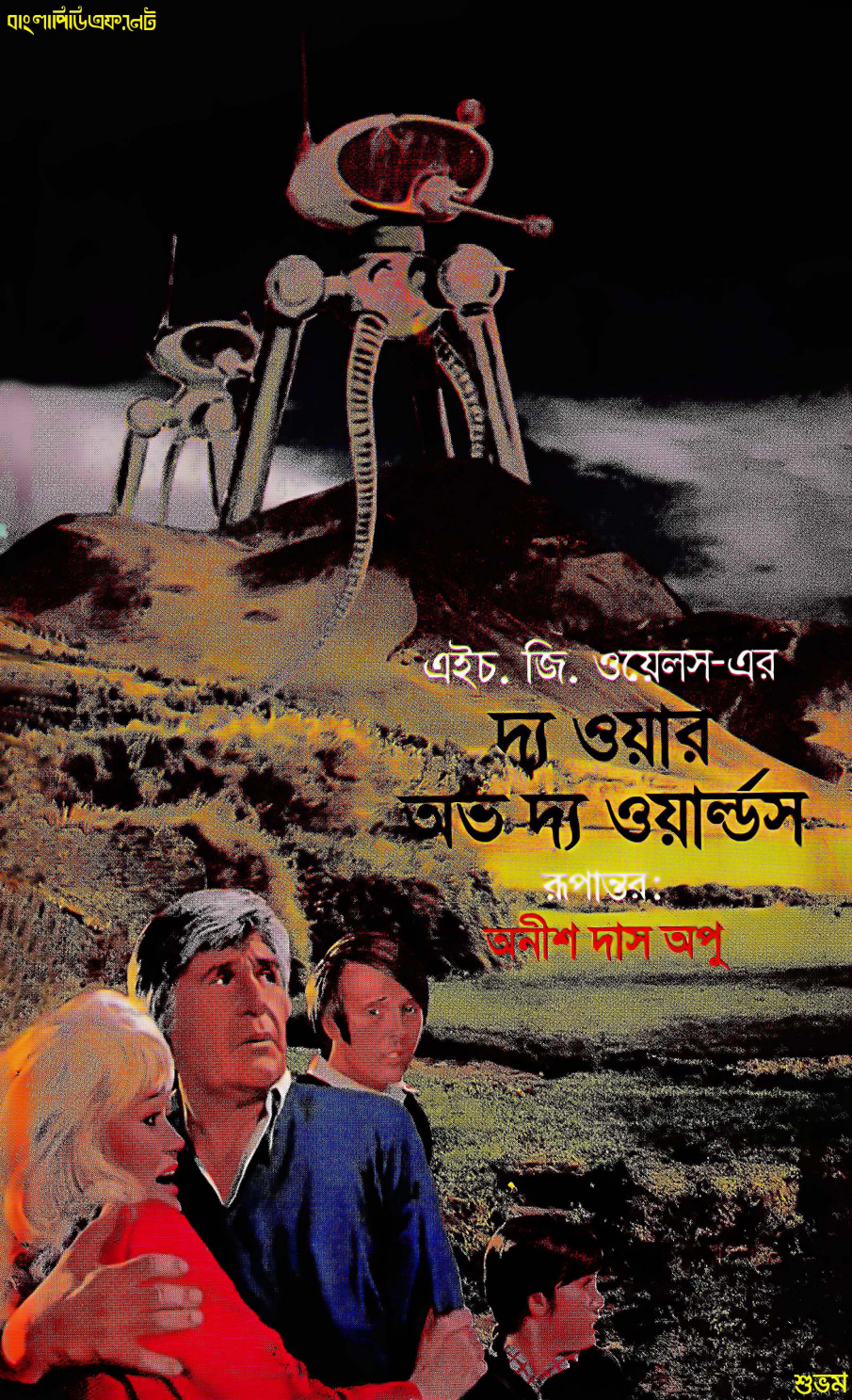

এইচ. জি. ওয়েলস-এর

দ্য ওয়ার অভ দ্য ওয়ার্ল্ডস

রূপান্তর:

অনীশ দাস অপু

শুভম

এইচ.জি.ওয়েলস-এর

দ্য ওয়ার অভ দ্য ওয়ার্ল্ডস

রূপান্তর

অনীশ দাস অপু

প্রজাপতি প্রকাশন

প্রকাশক
কাজী শাহনূর হোসেন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
গ্রন্থস্বত্ব লেখকের
প্রথম প্রকাশ
১৯৯৬
প্রচ্ছদ
হাসান খুরশীদ রুমী
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগ
প্রজাপতি প্রকাশন
[সেবা প্রকাশনীর অঙ্গ-প্রতিষ্ঠান]
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
ফোন: ৮৩৪১৮৪
পরিবেশক
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

THE WAR OF THE WORLDS
By: H.G. Wells
Trans. by: Anish Das Apu
ISBN 984-462-662-5
মূল্য ॥ বিয়াল্লিশ টাকা

বড়দা আহমদ আজাদকে
SUVOM
আমাকে লেখার উৎসাহ যুগিয়ে চলেন নিরন্তর
অথচ নিজে লেখেন না এক কলমও

দ্য ওয়ার অভ দ্য ওয়ার্ল্ডস

মূলঃ এইচ.জি. ওয়েলস

রূপান্তরঃ অনীশ দাস অপু

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

HTTPS://WWW.FB.COM/GROUPS/BANGLAPDF.NET/

WEBSITE:

WWW.BANGLAPDF.NET

১৮৯৪ সালের ১৩ আগস্ট। মধ্যরাত। হঠাৎ আকাশের বুকে ঝলসে উঠল আগুনের লম্বা একটি রেখা, যেন হিসিয়ে উঠল অসংখ্য বিষাক্ত নাগ, সবুজ একটা দাগ পেছনে ফেলে ওটা আছড়ে পড়ল লণ্ডনের হরশেল শহরের খাদে। 'উল্কা পতন' ভেবে ব্যাপারটিকে কেউ প্রথমে গুরুত্ব দিল না। জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওগিলভি আর লেখক-সাংবাদিক ওয়েলস শুধু জানতেন আসল ব্যাপারটি কি। কিন্তু কাউকে সাবধান করে দেয়ার সুযোগও তাঁরা পেলেন না। তার আগেই খাদের অন্ধকার থেকে উঠে এল ওরা, হাতে ভয়ঙ্কর তাপ-রশ্মি। আঁতকে উঠল গোটা লণ্ডন শহর। একশো ফুট লম্বা, বিকট-দর্শন এই ধাতব-দানবগুলো কারা? কারা এদের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা? কিছু বুঝে ওঠার আগেই শুরু হয়ে গেল স্মরণকালের ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ। বিভীষিকার ঢেউ নেমে এল গোটা বিশ্বে। পৃথিবীর ধ্বংস কি তাহলে আসন্ন? জানতে হলে পড়তেই হবে শ্বাসরুদ্ধকর এই ক্লাসিক সায়েন্স-ফিকশন।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

১৮৯৪, ১৩ আগস্ট। লণ্ডন। ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার খবরটি ছোট বলেই হয়তো অনেকের চোখ এড়িয়ে গেল। খবরটি এরকম:

মঙ্গলগ্রহে আগুনে গ্যাসের বিস্ফোরণ

জাভা দ্বীপ থেকে প্রেরিত এক খবরে জানা যায়, গত ১২ আগস্ট, মধ্য রাতে, মঙ্গলগ্রহের সারফেসে পরপর বেশ কয়েকবার হাইড্রোজেন গ্যাসের অত্যুজ্জ্বল বিস্ফোরণ ঘটে। তীব্র গতিতে এই জ্বলন্ত গ্যাস শিখা পৃথিবীর দিকে ধাবমান হইতেছে মনে হইলেও, মিনিট পনেরোর মধ্যে উহা হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়।

অনেকের মত আমারও নজর এড়িয়ে গিয়েছিল খবরটি। তাই কল্পনাতেও আসেনি এই খবর ভবিষ্যতে আসলে আমাদের জন্য কি ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন নিয়ে আসছে, বিপন্ন হতে চলেছে গোটা মানব জাতির অস্তিত্ব। সংবাদটা হয়তো অজানাই থেকে যেত যদি পরদিন সকালে, মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে আমার পুরানো, জিগরী দোস্ত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ওগিলভির সঙ্গে দেখা না হত।

'এই যে, ওয়েলস,' দূর থেকে আমাকে দেখে চেঁচালেন বুড়ো। 'মঙ্গলগ্রহের খবরটা নিয়ে ভেবেছ কিছু?'

'খবর?' বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলাম আমি। 'চার কোটি মাইল দূরের একটা গ্রহের আবার নতুন কি খবর হতে পারে?'

'দারুণ খবর আছে হে।' উত্তেজিত শোনাল ওগিলভির কণ্ঠ।

'অবিশ্বাস্য ব্যাপার-স্যাপার ঘটছে ওখানে। মঙ্গলের সারফেসে বিশাল এক বিস্ফোরণ ঘটেছে।'

কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকালাম জ্যোতির্বিজ্ঞানী বন্ধুটির দিকে। ওঁর উত্তেজনাকে তেমন পাত্তা দিলাম না।

আমার মনোভাব টের পেয়েই বোধহয় প্রস্তাবটা দিলেন ওগিলভি। 'আমার বাসায় চলে এসো না আজ রাতে? একসঙ্গে নক্ষত্র দেখা যাবে।'

মেঘমুক্ত আকাশে নক্ষত্রের রাত দেখতে ভালই লাগে আমার। তাই রাজি হয়ে গেলাম ওঁর কথায়। বললাম যাব।

ওইদিন মাঝ রাত। টেলিস্কোপে চোখ লাগিয়ে কালো আকাশের

সামিয়ানায় হরেক রঙের হীরকখণ্ড দেখছি, হঠাৎ মঙ্গলগ্রহকে ঘিরে লালচে একটা আলোর বৃত্ত নজর কাড়ল আমার। 'আরে, ওগিলভি। একবার আসুন তো এদিকে।' প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

তখন স্বপ্নেও ভাবিনি লাল আলোর ঝলকটা আসলে মঙ্গলগ্রহ থেকে ছুঁড়ে দেয়া একটা বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র, মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে নিক্ষেপ করা হয়েছে পৃথিবীর দিকে। চার কোটি মাইল দূর থেকে আসছে ওটা মৃত্যু আর ধ্বংসের বার্তা নিয়ে।

ওগিলভি ঘণ্টাখানেক টেলিস্কোপ নিয়ে ব্যস্ত থাকার পরে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালে জানতে চাইলাম, 'আচ্ছা, ওগিলভি। মঙ্গলবাসীরা আমাদের কোন সঙ্কেত পাঠাচ্ছে না তো?'

'দূর, কি যে বলো তুমি!' হেসেই আমার কথা উড়িয়ে দিলেন তিনি। 'হয়তো মঙ্গলে বেশ কিছু উল্কা পতন হয়েছে কিংবা বিশাল কোন অগ্নিগিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে।'

'কিন্তু আপনি যে বলেন মঙ্গলে জীবনের চিহ্ন থাকতে পারে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ওখানে জীবন বিকাশের সম্ভাবনা লাখে এক ভাগ।' জবাব দিলেন তিনি। 'নিশ্চই জানো সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব চোদ্দ কোটি মাইল। আমরা এখানে যে পরিমাণ তাপ এবং আলো পাই, ওখানে সেটার পরিমাণ অর্ধেকেরও কম। তীব্র ঠাণ্ডার কারণে ওই গ্রহে মানুষ বাঁচতেও পারবে না। আর মঙ্গলের তাপমাত্রা দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে।'

'কিন্তু ওখানে তো পানি এবং বাতাস আছে,' যুক্তি দেখাতে চাইলাম। 'জীবন বিকাশের জন্য এ দুটো কি উপযোগী নয়?'

'হতে পারে···হতে পারে,' অন্যমনস্কভাবে বললেন ওগিলভি। 'কিন্তু ওখানে জীবন থাকলেও আমাদের মত উন্নত নয়।'

তখন কি আর ছাই জানতাম ওখানে যাদের বাস এবং যারা গভীরভাবে অনেক দিন ধরে পৃথিবীবাসীকে পর্যবেক্ষণ করে আসছে, তারা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান। তবে অস্ত্র বিদ্যায় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে আমাদের চেয়ে এক শতাব্দী এগিয়ে। শুধু তাই নয়, ওরা আমাদেরকে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী বলে মনে করে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার, মঙ্গলবাসীদের নিজেদের গ্রহ ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলছিল বলে এদের ঈর্ষাকাতর দৃষ্টি ছিল আমাদের সবুজ, শ্যামল গ্রহটির

দিকে। জানতাম না ওরা এই গ্রহ দখলের পাঁয়তারা করছে। শুরু হতে যাচ্ছে মানব জাতির জীবনে এক ভয়াবহ বিপর্যয়।

শুধু ওই রাতে নয়, পরপর আরও কয়েক রাতে, এক নাগাড়ে দশদিন মঙ্গলে ওরকম তীব্র বিস্ফোরণ অনেকেই লক্ষ করল। দশদিন পর হঠাৎ কেন বিস্ফোরণ বন্ধ হয়ে গেল ব্যাখ্যা করতে পারল না কেউ।

কিন্তু এদিকে মঙ্গলবাসীদের নিক্ষিপ্ত মিসাইল প্রতি সেকেণ্ডে কাছিয়ে আসতে লাগল পৃথিবীর দিকে। ব্যাপারটা নিয়ে তেমন মাথা ঘামায়নি কেউ, আকস্মিক মহা দুর্যোগের কথাও কারও কল্পনাতে আসেনি। তাই সবাই নিশ্চিন্ত মনে নিজেদের দৈনন্দিন কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকল। শুধু মাঝে মাঝে, কৌতূহলী দু'একজন তাকাল আকাশের দিকে। কখনও উজ্জ্বল রঙের মঙ্গল নামের গ্রহটি তাদের চোখে পড়ল, কখনও আবার এড়িয়ে গেল নজর।

দুই

তারপর এল সেই ভয়াল রাত। আকাশের বুকে ঝলসে উঠল আগুনের লম্বা একটি রেখা, যেন হিসিয়ে উঠল অজস্র বিষাক্ত নাগ, সবুজ একটা দাগ পেছনে রেখে ওটা আছড়ে পড়ল পৃথিবীতে। যারা দৃশ্যটা দেখল, উল্কা পতন হিসেবে ব্যাপারটিকে ধরে নিল তারা। তাই ঘটনাটার প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রায় কেউই দেখাল না।

কিন্তু ওগিলভি গুরুত্ব দিলেন। তারাটা পড়েছে হরশেল, চবহ্যাম আর ওকিং শহরের মাঝখানে বিস্তৃত এক পতিত জমিতে, বালির খাদগুলোর পাশে।

পতনের আঘাতে বিশাল এক গহ্বর সৃষ্টি হলো মাটিতে, বালি আর পাথর বৃষ্টির মত ছিটকে উঠল শূন্যে, বিরাট এক টিলার আকৃতি পেল। এক মাইল দূর থেকেও স্পষ্ট চেনা গেল। গর্তটার পাশে যে সব সবুজ ঝোপঝাড় ছিল, সবগুলোতে আগুন ধরে গেল দাউ দাউ করে। আর অতিকায় জিনিসটা বালুর মধ্যে যেন ডুব মেরে থাকল।

ওগিলভি গর্তের কাছে গিয়ে দেখলেন জিনিসটার একটা পাশ অনেকটাই উন্মুক্ত। নব্বুই ফুট ব্যাসার্ধের বিশাল একটা সিলিণ্ডার যেন

ওটা, বাইরের আবরণ শক্ত, ধূসর রঙের। ওটার গা থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে তাপ, ওগিলভি আরও কাছে যেতে সাহস করলেন না।

অনেকক্ষণ গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে থাকলেন ওগিলভি। ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে সিলিণ্ডারের মধ্য থেকে কি যেন নড়াচড়ার অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। তারপরই ওটার গা থেকে ধূসর রঙের আবরণ খসে পড়তে লাগল। অস্বস্তি অনুভব করলেন ওগিলভি। 'আরে, সিলিণ্ডারের মাথা থেকে ওগুলো খসে পড়ছে কেন?' বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'উল্কাটা ঠাণ্ডা হলে তো সমস্ত শরীর থেকে ছাল খসে পড়ার কথা!'

তারপর দেখা গেল সিলিণ্ডারের গোলাকার মাথাটা ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করেছে। ঝাঁকি খেয়ে ইঞ্চি দু'য়েক ওপরে উঠে গেল ওটা।

'আরি!' চিৎকার করে উঠলেন ওগিলভি। 'সিলিণ্ডারটা তো ফাঁকা! কেউ বোধহয় বেরিয়ে আসতে চাইছে! কিন্তু এরা এল কোত্থেকে—?' হঠাৎ ব্যাপারটা মনে পড়তেই যেন ধাক্কা খেলেন তিনি। 'নির্ঘাত মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে! ইস, বেচারারা ভেতরে আটকা পড়েছে। ওদেরকে আমার উদ্ধার করতেই হবে।'

তাপের কথা ভুলে সিলিণ্ডারের দিকে দৌড় দিলেন ওগিলভি। কিন্তু কাছাকাছি আসতেই রেডিয়েশনের ধাক্কায় থমকে দাঁড়াতে হলো তাঁকে। এক মুহূর্ত পাথর হয়ে থাকলেন বুড়ো, তারপর পড়িমরি করে ছুটলেন ওকিং শহরের দিকে, সাহায্যের আশায়।

সাতসকালে বুড়োর কথায় কেউ কানই দিল না। স্রেফ পাগল ঠাউরে চলে গেল যে যার কাজে। কিন্তু সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নন ওগিলভি। সাংবাদিক হেণ্ডারসনকে বাগানে দেখতে পেয়ে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন তিনি।

'হেণ্ডারসন,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ওগিলভি। 'কাল রাতের উল্কাপতন দেখেছ? ওটা হরশেল-এর খাদে পড়েছে।'

'তাই নাকি?' উত্তেজিত গলায় বলল হেণ্ডারসন। 'আকস্মিক উল্কাপতন—বাহ্, বেড়ে স্টোরী লিখতে পারব!'

'ওটা স্রেফ উল্কা নয়,' চিৎকার করলেন ওগিলভি।

'একটা সিলিণ্ডার—ফাঁপা একটা সিলিণ্ডার—কি যেন আছে ভেতরে!'

কোদাল হাতে স্থির হয়ে গেল হেণ্ডারসন। 'কি বললেন?'

ওগিলভি এবার সব কথা খুলে বললেন ওকে। সব শুনে আর সময় নষ্ট করল না হেণ্ডারসন। 'স্টোরী'র আশায় দৌড়াল সে বুড়োর সঙ্গে হরশেল খাদের দিকে।

সিলিণ্ডারটা এখনও আগের জায়গায় পড়ে আছে। কিন্তু কোন শব্দ আসছে না। ভেতর থেকে। লাঠি দিয়ে বার কয়েক সিলিণ্ডারের গায়ে খোঁচা দিলেন ওগিলভি এবং হেণ্ডারসন। নাহ্, কোন সাড়াশব্দ নেই।

'হয় ওরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে নয়তো মারা গেছে।' ফিসফিস করে বললেন ওগিলভি।

'না! না!' চেঁচিয়ে উঠল হেণ্ডারসন। 'ওদেরকে জীবিত পেতেই হবে।' লাঠি দিয়ে আবার গুঁতো দিল সে। সিলিণ্ডারের মুখের দিকে চেয়ে হাঁক ছাড়ল, 'ওহে, তোমরা যে-ই হও। ওখানেই থাকো। তোমাদেরকে আমরা বের করে আনার ব্যবস্থা করছি।'

আবার ওকিং-এ ফিরে এল দু'জনে। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার স্বরে জানান দিল তারা কি দেখে এসেছে। লোকজন মাত্র ঘুম থেকে উঠতে শুরু করেছে, দোকানীরা ঝাঁপ খুলছে, এই সময় দুই শ্রীমানের চেঁচামেচিতে তারা যারপরনাই বিরক্ত হলো। অবশ্য ওদের বিরক্তি গায়ে মাখলেন না ওগিলভি এবং হেণ্ডারসন। হেণ্ডারসন তড়িঘড়ি ছুটল রেল স্টেশনে। আশ্চর্য খবরটা টেলিগ্রাফ করে দিল লণ্ডনে।

আর আমি এই খবর জানলাম আমার হকারের কাছ থেকে। সকালে খবরের কাগজ দিতে এসে সব বয়ান করল সে।

'প্রথমে পাত্তা না দিলেও,' চোখ বড় বড় করে বলল ছোকরা, 'পরে ওকিং শহরের সবাই বিজ্ঞানী সাহেবের পিছু পিছু ছুটেছে মঙ্গলবাসীদের লাশ দেখতে।'

খবরটা প্রথমে বিস্মিত করলেও দেরি না করে ঘটনাস্থলের দিকে আমিও ছুটলাম।

'মঙ্গলগ্রহ থেকে বার্তা' এই শিরোনামে শহরের প্রায় সবগুলো দৈনিকে খবরটা ছাপা হবার কারণে বালির খাদের কাছে মানুষের ঢল নেমেছে। ঘোড়া, ঘোড়ার গাড়ি, সাইকেল যে যাতে পারে চড়ে এসেছে।

খাদের ধারে এসে দেখি নিচে প্রায় হাফ ডজন লোক খোন্তা কুড়োল নিয়ে লেগে গেছে কাজে। ওগিলভি আর হেণ্ডারসনের সঙ্গে সরকারী

জ্যোতির্বিদ স্টেন্টকেও চোখে পড়ল।

স্টেন্ট দাঁড়িয়ে আছে সিলিণ্ডারের পাশে, ঘামে চকচকে মুখ, নির্দেশ দিচ্ছে শ্রমিকদের। লোকগুলো সিলিণ্ডারের ধূসর বর্ণের শক্ত ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত।

'এই যে, ওয়েলস,' আমাকে দেখে ডাকলেন ওগিলভি। 'সিলিণ্ডারের ভেতরে হালকা নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু মুখটা খুলতে পারছি না। নিজ থেকে জিনিসটার মুখ না খোলা পর্যন্ত আমাদেরকে এখানে অপেক্ষা করতে হবে।'

অপেক্ষা করতে সায় দিল না মন। ভিড় ঠেলে চলে আসছি, হঠাৎ এক যোগে চিৎকার করে উঠল সবাই। একটা ধাক্কা ধাক্কি শুরু হলো।

'ওটা ন-নড়তে শুরু করেছে,' একটা ছেলে আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে যাবার সময় বলল, 'মুখও খুলছে। আমি আর এখানে নেই, বাবা!'

সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলাম খাদের ধারে। জিনিসটা অদ্ভুত, গোঙানির মত আওয়াজ শুরু করেছে, ওটার মুখ খুলে যাচ্ছে…যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেউ ভেতর থেকে খুলে ফেলছে!

হঠাৎ ভিড়ের মধ্য থেকে কে যেন আছড়ে পড়ল আমার গায়ে, ছিটকে পড়ে গেলাম মাটিতে। গড়িয়ে নিচে পড়ার হাত থেকে নিজেকে রক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত, হঠাৎ একটি ধাতব শব্দ কানে এল। ইতিমধ্যে ভারসাম্য ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আমি। পেছন ফিরে দেখলাম সিলিণ্ডারের ঢাকনা মাটিতে পড়ে আছে। আর ওগিলভি তাঁর লোকজন নিয়ে গর্তের ওপরে ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি লাগিয়েছেন।

মনে হলো সিলিণ্ডার থেকে একটা মানুষ বুঝি বেরিয়ে এল—না, ঠিক মানুষ নয়, সেরকম দেখতে। সিলিণ্ডারের ভেতরে, ছায়া ছায়া আকৃতিগুলোর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালাম। ধূসর রঙের কি যেন একটা নড়ে উঠল। একটার ওপর আরেকটা, তারপর উজ্জ্বল দুটো বৃত্তে রূপ নিল ওগুলো—যেন এক জোড়া চোখ। একটু পরে, লাঠির মত মোটা, ছোট্ট, ধূসর একটা সাপ যেন, বৃত্তটার মাঝখান থেকে কিলবিলিয়ে উঠল, মোচড় খেতে খেতে বেরিয়ে এল ওপরে। প্রথমে একটা, তারপর আরেকটা, তারপর আরও একটা।

পিছিয়ে এলাম আমি গর্তের ধার থেকে, চোখ বিস্ফারিত। আঠার মত দৃষ্টি সেঁটে থাকল অক্টোপাসের মত শুঁড়গুলোর গায়ে। ভয়ের ঠাণ্ডা

স্রোত জমিয়ে দিল আমাকে। লোকজন চিৎকার করে ছুটে পালাতে লাগল আমার চারপাশ দিয়ে।

আতঙ্কিত আমি দাঁড়িয়েই থাকলাম। দেখলাম ভালুকের মত বিশাল আর গোলাকার একটা মাথা বেরুল সিলিণ্ডারের মুখ দিয়ে। সূর্যের শেষ রশ্মিতে ওটাকে চোপসানো চামড়ার মত লাগল।

বিরাট, কালো দুটো চোখ বিকট দৃষ্টিতে তাকাল আমার দিকে। ওটার কপালের দিকটা সমতল, ভ্রু-র জায়গাটাও তাই। লেপাপোঁছা। চোখ দুটোকে ঘিরে গোলাকার আকৃতিটা অনেকটা মুখের মত। চোখের নিচে ইংরেজী 'ভি' আকৃতির অদ্ভুত মুখ, ওপরের ঠোঁট কোঁচকানো, লালা ঝরছে। প্রাণীটা কাঁপছে, যেন খিঁচুনি ধরেছে। কাঠের গোঁজের মত নিচের ঠোঁট। তার নিচে চিবুকের চিহ্নমাত্র নেই।

সিলিণ্ডারের মুখটা সরু একটা শুঁড় এসে যেন খামচে ধরল, আরেকটা দুলতে লাগল বাতাসে। বীভৎস চেহারার দানবটা হঠাৎ সিলিণ্ডারের এক ধার থেকে পিছলে গেল, ধপ করে গর্তের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। যেন চামড়ার একটা বস্তা ফেলা হলো মাটিতে। বিকট সুরে চেঁচিয়ে উঠল ওটা। সঙ্গে সঙ্গে ওর আরেক জাতভাই'র আবির্ভাব ঘটল সিলিণ্ডারের খোলা মুখে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে এবার দৌড় শুরু করলাম আমি। গাছপালার মাঝে হোঁচট খেতে খেতে পেছন ফিরে তাকালাম। গর্তের ধারে এখনও কিছু লোক দাঁড়ানো। ভীত, বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিকট প্রাণীগুলোর দিকে। ভয়ে আমি যেন অবশ হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু তারপরও মাথা থেকে মঙ্গলগ্রহের এই অদ্ভুত প্রাণীগুলোর কথা কিছুতেই দূর করতে পারছিলাম না।

তিন

খুব ইচ্ছে করলেও খাদের কাছে যাবার সাহস হলো না। একটা উঁচু টিলার আড়ালে লুকিয়ে মঙ্গলবাসীদের কার্যকলাপের ওপর লক্ষ রাখলাম।

অক্টোপাসের বাহুর মত লম্বা, কালো কতগুলো শুঁড় একবার

লকলকিয়ে উঠল গর্তের মাথায়। পরক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরেই কাঠির মত একটা রড মাথা তুলল, ধীরে ধীরে উঠতে লাগল ওপর দিকে। রডের মাথায় একটা গোলাকার চাকতি, এলোমেলোভাবে ঘুরছে। কি ওটা?

খাদের বিপরীত মুখে ইতিমধ্যে পালিয়ে যাওয়া লোকজন এসে জড় হয়েছে। দু'টি দলে ভাগ হয়ে তারা উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। আমি ছোট্ট একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠলাম। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলাম ওখানে। এক সময় সূর্য অস্ত গেল। কিন্তু ঘটল না কিছুই। সাহস পেয়ে লোকজন এবার ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে এগোল খাদের দিকে।

হঠাৎ দেখি একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন ওগিলভি, স্টেন্ট এবং হেণ্ডারসন। হাতে সাদা পতাকা, পা বাড়ালেন তাঁরা খাদের দিকে।

'কি করছেন আপনারা?' চিৎকার করে জানতে চাইলাম আমি।

'একটা মীটিং করেছি আমরা,' জবাব দিলেন ওগিলভি।

'মীটিং-এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে মঙ্গলবাসীরা বিপুলায়তনের হলেও বেশ বুদ্ধিমান। আমরাও যে ঘটে কম বুদ্ধি রাখি না সেটাই ওদের জানাতে যাচ্ছি।'

আমি একটা মন্তব্য করার জন্য মাত্র মুখ খুলেছি, হঠাৎ খাদ থেকে ছিটকে এল আলোর একটা ঝলক, পরমুহূর্তে শূন্যে একের পর এক বিস্ফোরিত হলো অত্যন্ত শক্তিশালী সবুজ রঙের তিনটি শিখা, সেই সঙ্গে মৃদু হিসহিসে একটা শব্দ ভেসে এল। বিদ্যুৎগতিতে শব্দটা পরিণত হলো উচ্চ নিনাদে।

এই সময় ওটাকে দেখলাম আমি। কানে তালা লাগানো অসহ্য গুনগুন ধ্বনি নিয়ে গোলাকার গম্বুজের মত আকৃতিটা ধীরে ধীরে উঠে এল খাদের অন্ধকার থেকে। সাদা আলোয় চোখ ঝলসানো বিচ্ছুরণ ছুটে গেল ওটা থেকে, সাদা পতাকাবাহী মানুষগুলোকে ছোবল মারল। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত মশালে পরিণত হলো সব ক'জন, পাগলের মত ছুটোছুটি করল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর পড়ে গেল।

নিজের অজান্তে দাঁড়িয়ে গেলাম আমি। অবিশ্বাসের চোখে দেখলাম শব্দহীন এই অগ্নিশিখা চোখের পলকে খাদ ঘিরে দাঁড়ানো সমস্ত নারী, পুরুষ আর শিশুদের গ্রাস করে নিল। গাছপালা আর ঝোপঝাড় জ্বালিয়ে

আগুনের লম্বা জিভ ছুটল দূরবর্তী কাঠের বাড়িঘরের দিকে।

একটু পরেই সাদা মৃত্যুদূত ঘুরল আমার দিকে। আমি যে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে আগুনের শিখা মাত্র লাফিয়ে আসতে শুরু করেছে, হঠাৎ হিসহিসে শব্দ আর গুঞ্জনধ্বনি থেমে গেল। গম্বুজাকৃতির কালো জিনিসটা অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের সামনে থেকে, ডুব দিয়েছে খাদের গহ্বরে।

এত দ্রুত গোটা ব্যাপারটা ঘটল যে আমি কিছুই ভাল করে ঠাহর করতে পারলাম না। হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম আরও কিছুক্ষণ। নিজের ভাগ্যকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হলো না। এই অগ্নিশিখা বা বিধ্বংসী তাপ-রশ্মি, যাই বলি না কেন, পুরো বৃত্ত করে যদি ধেয়ে আসত, তাহলে নির্ঘাত ওটার নাগালে পড়ে যেতাম আমি। কিন্তু ওটা আমার পাশ দিয়ে যাবার কারণে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছি।

নিচে তাকালাম। একটু আগেও খাদের ধারে মানুষের যে ছোট দলগুলোকে দেখেছি তাদের চিহ্নমাত্র নেই। প্রথম শিখা বিস্ফোরণের পর যারা পালাতে পেরেছে তারা হয়তো উঁচু টিলার আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। আমার অনুমান সত্য। অনেকেই তাপ-রশ্মির হাত থেকে রক্ষা পেতে টিলার আড়ালে চলে গিয়েছিল। কিন্তু টিলার মাথায় গাছপালা রক্ষা পায়নি আগুনে আক্রমণের হাত থেকে। দাউ দাউ করে জ্বলছে ওগুলো। জ্বলন্ত, ভাঙা ডাল নিচে ছিটকে পড়তেই ওখানকার লোকগুলো হাউমাউ করে উঠল। আগুন ধরে গেছে তাদের জামাকাপড়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করতে করতে অন্ধকারের মধ্যে তারা ওকিং শহরের দিকে ছুটল।

হঠাৎ টের পেলাম দিগন্ত বিস্তৃত এই অন্ধকার পতিত জমিতে আমি সম্পূর্ণ একা। নিজেকে অসহায় এবং নিরাপত্তাহীন মনে হলো। ভয় আর আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। কতবার যে গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম তার হিসেব নেই। অগ্নিদগ্ধ অসংখ্য লাশ পায়ে মাড়িয়ে ছুটছি আমি। দৌড়াতে দৌড়াতে এক সময় ফুরিয়ে গেল দম। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম রাস্তায়। চিৎ হয়ে কতক্ষণ ওখানে ছিলাম মনে নেই।

আস্তে আস্তে দম ফিরে পেলাম। কিন্তু তারপরও অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম। একসময় উঠে বসলাম আমি। একটু আগে ঘটে যাওয়া

ঘটনাটাকে দুঃস্বপ্ন বলে ভাবতে ইচ্ছে করল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম আমি, মাতালের মত পা বাড়ালাম সামনে। চারপাশের প্রকৃতি, নির্জন রাত, সামনেই মেবারি হিল-এ আমার বাড়ি, দূরে ট্রেন যাবার শব্দ—সবকিছু বড় শান্ত, স্বাভাবিক আর একান্ত নিজের মনে হলো। অথচ পেছনে···

মেবারিতে পৌঁছে প্রথমেই সাক্ষাৎ হলো দু'জন লোক আর এক মহিলার সঙ্গে। একটা বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

'ওদিকের কি খবর?' খাদের দিকে ইঙ্গিত করে হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'খবর তো আপনারই বেশি জানার কথা।' বলল একজন।

'আপনি তো ওদিক থেকেই এলেন।'

'লোকজন হরশেলের খাদ সম্পর্কে কি সব আজেবাজে কথা বলছে,' মন্তব্য করল মহিলা। 'হচ্ছেটা কি ওখানে?'

'কেন, মঙ্গল থেকে অদ্ভুত কিছু প্রাণী এসেছে জানেন না আপনি?' অবাক হলাম আমি।

'ব্যস, ব্যস। আর বলতে হবে না।' হেসে উঠল সে। পুরুষ দু'জনও তার সঙ্গে যোগ দিল। যেন মস্ত এক ঠাট্টা করেছি আমি।

'কিন্তু ওই তাপ-রশ্মি···' বলতে চাইলাম আমি, 'আর ওগিলভি, হেণ্ডারসন এবং স্টেন্ট···' কিন্তু ওদের হাসির তোড়ে কথা শেষ করতে পারলাম না।

ভয়ানক রাগ হলো আমার। 'দাঁত কেলিয়ে আর হাসতে হবে না। আপনাদের কপালে খারাবি আছে।' বলে গটগট করে চলে এলাম ওখান থেকে।

আমার ছেঁড়াখোড়া পোশাক আর বিধ্বস্ত চেহারা দেখে আমার স্ত্রী খুবই অবাক হলো। কিন্তু তক্ষুণি কিছু জানতে না চেয়ে নিয়ে গেল ডাইনিং রুমে। ওয়াইন খেতে দিল।

তরল আগুনটা শরীরে একটু শক্তি যোগাল। সব কথা এবার খুলে বললাম সহধর্মিণীকে। ত্রাস ফুটে উঠল ওর চেহারায়। অভয় দিয়ে বললাম, 'ভয় পেয়ো না, ডিয়ার। মঙ্গলের প্রাণীগুলোকে আমার কুঁড়ের বাদশা মনে হয়েছে। নড়েচড়ে না বললেই চলে। সম্ভবত খাদ ছেড়ে ওরা অন্য কোথাও যাবে না। তবে খাদের কাছে কেউ এলে তাকে রেহাই

দেবে কিনা সন্দেহ।'

'কিন্তু আমার মন বলছে,' গলা কেঁপে উঠল ওর, 'ওরা এদিকেও আসতে পারে।'

ভীত ভাবটা দূর করতে ওর জন্য গ্লাসে মদ ঢাললাম আমি। বললাম, কিন্তু ওরা তো নড়াচড়াই করতে পারবে না। মঙ্গলের চেয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তিনগুণ বেশি। তার মানে এখানে মঙ্গলবাসীদের তাদের গ্রহের চেয়ে তিনগুণ বেশি ওজন বইতে হবে। এত ওজন নিয়ে সীসার মত ভারী হয়ে থাকবে শরীর। ফলে নট নড়ন নট চড়ন।'

কিন্তু ওর চেহারায় এখনও উদ্বিগ্ন ভাব। 'তাহলে ওরা অতগুলো মানুষ কেন খুন করল?'

'সম্ভবত বেশি লোকজন দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল।' আশ্বস্ত করতে চাইলাম ওকে। 'হয়তো জীবিত কোন প্রাণীকে দেখবে আশাই করেনি। যাকগে, ওসব মঙ্গলবাসী-টাসি এখন ছাড়ো তো। ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবে সরকার আর পুলিশ। এখন বলো তো, আজ রাতের ডিনারে কি মেনু করেছ?'

খেতে বসে জানতাম না স্ত্রীর হাতের এই সুস্বাদু রান্নার স্বাদ থেকে আমাকে বঞ্চিত থাকতে হবে বহুদিন। জানতাম না অনাহার, ক্ষুধা আর দুর্যোগের মধ্যে আমাকে অনেকগুলো বিভীষিকাময় দিন কাটাতে হবে।

চার

শুক্রবার সন্ধ্যায় সারা ইংল্যাণ্ডের মানুষ যথারীতি তাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ব্যস্ত থাকলেও, ওকিং, হরশেল এবং চবহ্যাম-এর গ্রামবাসীরা আবার আঁতকে উঠল মঙ্গলবাসীদের তাপ-রশ্মির আকস্মিক বিচ্ছুরণে। কিছু দুঃসাহসী মানুষ খাদের কাছে গিয়েছিল ওদের এক নজর দেখতে। তাপ-রশ্মির আঘাতে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তারা।

ওইদিন সারারাত জেগে থাকল মঙ্গলবাসীরা। গুঞ্জন ধ্বনি আর হিসহিসে শব্দে ঘুমাতে পারল না আশপাশের লোকজনও। প্রায়ই সিলিণ্ডার থেকে নিক্ষিপ্ত সবুজ-সাদা রঙের ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠতে লাগল রাতের আকাশে।

রাত এগারোটার দিকে পুলিশ এল হরশেল আর চবহ্যাম শহরে। খাদের চারপাশ ঘিরে রাখল তারা। ঢুকতে দিল না কাউকে ভেতরে।

মাঝরাতের দিকে, ওকিং-এর চের্টসি রোডের ধারে কিছু ছিন্নমূল মানুষ আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়তে দেখল উত্তর-পশ্চিমের পাইনের জঙ্গলে। তারাটির রঙ সবুজ, ছিটকে পড়ার সময় গায়ে জ্বলে উঠল উজ্জ্বল আলো। নিঃশব্দ পতন হলো ওটার। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনাটাকে উল্কা পতন হিসেবে মনে করলেও আসলে ওটা ছিল মঙ্গল থেকে ছিটকে আসা আরেকটা সিলিণ্ডার।

পাঁচ

শনিবার সকালে বিছানা ছাড়লাম প্রবল দুশ্চিন্তা নিয়ে। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। দুঃস্বপ্ন দেখে বারবার আঁতকে উঠেছি। শেষ পর্যন্ত ঘুমের আশা ত্যাগ করে সোজা চলে এলাম বাগানে। একটু হাঁটাহাঁটি করব।

আমাদের দুধওয়ালা তখন বাড়ির সামনে দিয়েই যাচ্ছিল। আমাকে দেখে গাড়ি থামাল।

'খবর আছে কিছু?' জানতে চাইলাম আমি।

'আছে, স্যার। মঙ্গলবাসীদের চারদিকে ঘিরে আছে আমাদের পুলিশ বাহিনী। শিগগিরই বড়সড় যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে বলে অনেকের ধারণা। তবে ওদেরকে হত্যার আদেশ দেয়া হয়নি। বরং পারলে হত্যাকাণ্ড এড়িয়ে যাবার কথা বলা হয়েছে। ওরা বলল জঙ্গলে নাকি আরেকটা জিনিস পড়েছে।' দুধওয়ালা হাত তুলে দূরের একটা জায়গার ধোঁয়া দেখাল।

নাস্তা খেয়ে একবার খাদের দিকে যাব ভেবেছিলাম। কিন্তু সেনাবাহিনী অবরোধ করে রেখেছে রাস্তা। তাই ফিরে আসতে হলো।

সারাদিনেও মঙ্গলবাসীরা তাদের টিকিটিও দেখাল না। তবে গর্তের মধ্যে ওরা যে নিজেদের কাজে ব্যস্ত তা বোঝা গেল অনবরত হাতুড়ি পেটার শব্দে আর সিলিণ্ডার থেকে স্রোতের মত একটানা ধোঁয়া বেরুনোর কারণে।

বেলা তিনটার দিকে চের্টসি রোড থেকে কামান দাগার আওয়াজ পেলাম। শুনলাম পাইনের জঙ্গলে দ্বিতীয় যে সিলিণ্ডারটি পড়েছে ওটাকে ধ্বংস করার জন্য এই গোলা নিক্ষেপ।

সাঁঝের আঁধার প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, বাগানে বসে আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে চা খাচ্ছি, হঠাৎ খাদের কাছ থেকে পরপর কয়েকবার ভোঁতা বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। তারপরই রাইফেলের শব্দ। পাহাড়ের কাছে কি যেন একটা ভয়ানক জোরে আছড়ে পড়ল, পায়ের নিচে মাটি কেঁপে উঠল থরথর করে। চোখ তুলে তাকাতেই দেখি মেবারি হিল স্কুলের গাছপালার মাথায় আগুন ধরে গেছে, ওটার পাশের ছোট গির্জাটার চুড়ো ভেঙে গুড়িয়ে গেছে। তারপরই প্রচণ্ড শব্দে আমার বাড়ির একটা চিমনি ভেঙে পড়ল, যেন বোমা মারা হয়েছে। ভাঙা টুকরোগুলো আমার পড়ার ঘরের, জানালার নিচে রাখা ফুলের বেডগুলোর ওপর ছিটকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করলাম আমরা যেখানে আছি, জায়গাটা মোটেও নিরাপদ নয়। কারণ এই এলাকা মঙ্গলবাসীদের তাপ-রশ্মির নাগালের মধ্যেই।

'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়,' সহধর্মিণীর হাত চেপে ধরে দৌড়ে রাস্তায় উঠে এলাম আমি।

'তাহলে কোথায় যাব?' আতঙ্কে কেঁদে ফেলার মত অবস্থা হলো ওর।

'লেদারহেডে!' খাদ থেকে ভেসে আসা গুলির শব্দ ছাপিয়ে চিৎকার করে বললাম আমি। 'তোমার মামা বাড়ি। তুমি দাঁড়াও এখানে। আমি চট করে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে আসছি!'

গাড়ি ভাড়া করে মেবারি হিল-এ ফেরার পথে দেখলাম সৈন্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকজনদের পালিয়ে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে।

স্ত্রী, চাকর-বাকর আর মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আমি ড্রাইভিং সীটে লাফিয়ে বসলাম। মাত্র যাত্রা শুরু করেছি, মেবারি হিল-এর এক পাশের রাস্তা ঘূর্ণায়মান কালো ধোঁয়ার বৃত্তে ঢাকা পড়ে গেল। আমরা অন্য রাস্তা ধরে লেদারহেডের উদ্দেশে ছুটলাম। দ্রুত সরে যেতে লাগলাম মানুষের আর্তনাদ, ধোঁয়া আর আগুনের কাছ থেকে।

আমাদের বাড়ি থেকে লেদারহেড মাত্র কুড়ি মাইল দূরে।

নিরাপদেই পৌঁছুলাম ওখানে। স্ত্রী বেচারীর মুখ ভয়ে শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। আমি আবার মেবারিতে ফিরব শুনে আঁতকে উঠল সে। 'ভয় নেই,' বললাম ওকে। 'তোমাকে তো বলেইছি ওজন সমস্যার কারণে মঙ্গলবাসীরা গর্ত ছেড়ে ওপরে উঠতেই পারবে না।' কিন্তু তারপরও ও আমাকে ছাড়তে চাইল না। কিন্তু ভাড়া করা গাড়ি আর ঘোড়া আমাকে ফিরিয়ে দিতে মেবারিতে যেতেই হবে। তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিতে হলো।

রাত এগারোটার দিকে আবার মেবারি'র পথ ধরলাম আমি। শহরের ধারে, একটা পাহাড়ের কাছে এসেছি, হঠাৎ বাঁদিকে সবুজ আলোর আকস্মিক বিস্ফোরণে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, বাঁ দিকে একটা মাঠ। তীব্র ঝলকটা নেমে এল আকাশ চিরে, প্রচণ্ড শব্দে আছড়ে পড়ল মাঠে। আরেকটা তারা!

চোখ ঝলসানো আলোতে যেন অন্ধ হয়ে গেলাম আমি, একই সঙ্গে বজ্রপাতের শব্দে লাফিয়ে উঠল আমার ঘোড়া। বৃষ্টি শুরু হয়েছে! পিচের মত কালো অন্ধকারে দু'হাত দূরেও দৃষ্টি যায় না। তবু শক্ত হাতে লাগাম ধরে বসে থাকলাম। ঘোড়াটা তীরের গতিতে ছুটতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যে ভিজে কাক হয়ে গেলাম। হঠাৎ মনে হলো কি যেন একটা মেবারি হিলের ঢাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। এই সময় আকাশ আলো করে বিদ্যুৎ চমকাল, এক সেকেণ্ডের জন্য দিনের মত পরিষ্কার দেখতে পেলাম ওটাকে।

বিশাল ধাতব জিনিসটা যেন তিন ঠেঙে এক দৈত্য। পাঁচতলা দালানের চেয়েও উঁচু, তিনটে ধাতব পায়ে হেঁটে চলেছে পাইনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে। ওটার বিশাল পায়ের আঘাতে ভেঙে টুকরো হয়ে গেল কচি গাছগুলো। হাঁটার তালে ভেসে এল ঠনঠন আওয়াজ, মিশে গেল বজ্রপাতের শব্দের সঙ্গে।

আবারও ঝলসে উঠল সাপের সোনালী চেরা জিভ। তিন পেয়ে দানবকে আরও স্পষ্ট দেখা গেল। মনে হলো তিন ঠ্যাঙে নয়, আসলে এক পায়ে লাফিয়ে চলেছে ওটা। বাকি পা দুটো উঁচিয়ে আছে আকাশের দিকে। একেক লাফে তিনশো ফুট দূরত্ব অতিক্রম করছে ওটা!

হঠাৎ আমার সামনের পাইনের জঙ্গল দু'ভাগ হয়ে গেল, আত্মপ্রকাশ করল দ্বিতীয় এক দানব। এমন কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি জীবনে দেখেনি

আমার ঘোড়া। ভয়ে দিশেহারা হয়ে সোজা ওটার দিকেই ছুটতে শুরু করল সে। চিন্তা করার শক্তি হারিয়ে ফেললাম আমিও। ডানদিকে ঘোড়াটাকে ঘুরাবার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁচকা টানে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল ঘোড়া, ডিগবাজি খেয়ে পড়ল। আমিও ছিটকে গেলাম গাড়ি থেকে। সোজা গিয়ে পড়লাম একটা পুকুরে।

পানিতে শুধু নাকটা উঁচিয়ে রাখলাম আমি। রাস্তার পাশে ঘাড় ভেঙে পড়ে আছে আমার বেচারা বাহন। ওল্টানো গাড়ির একটা চাকা এখনও ঘুরছে বন বন করে। ধাতব যন্ত্রটাকে ঠিক আমার দিকে আসতে দেখে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে এল। চুপ করে শরীর ডুবিয়ে থাকলাম। খুব ভাল ভাবে ওটাকে দেখতে পাচ্ছি আমি এখন। ধাতুর তৈরিই বটে যন্ত্রটা। তবে ঠিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যেন নয়। লম্বা তিন ঠ্যাঙের মাথায় একটা ছাতার মত—গম্বুজাকৃতি, একপাশ থেকে অন্যপাশে ক্রমশ ঘুরে চলেছে, যেন একটা মাথা, উঁকি দিয়ে পথের নিশানা খুঁজছে।

গম্বুজ থেকে ফুঁড়ে বেরিয়েছে লম্বা, নরম, ঝকমকে কয়েকটা শুঁড়, হাতের মত অদ্ভুত শরীরটার চারপাশে দোল খাচ্ছে।

ধাতব দানব আমার পাশ দিয়ে যাবার সময় মাথা তুলল আকাশের দিকে, যেন একশো নেকড়ে ডেকে উঠল সগর্জনে, 'আ-লু-উ-উ-উ! আ-লু-উ-উ-উ!' বিদ্যুতের আলোয় লক্ষ করলাম ওটার শরীরের পেছনে বেশ বড়, সাদা রঙের একটা ধাতব বাক্স ঝুলছে। হাঁটার সময় পায়ের গাঁটগুলো থেকে প্রচুর ধোঁয়া বেরুতে লাগল।

একটু পরেই জিনিসটা যোগ দিল তার সঙ্গীর সাথে। মোড় নিল বাঁয়ে, এগোল সবুজ ধোঁয়ার দিকে। আধা মাইল দূরে তাদের আরেক সঙ্গীর সাথে মিলিত হলো।

অন্ধকারে, পুকুরের মধ্যে চুপচাপ ভেসে রইলাম আমি, মাথার ওপর মুষলধারে বর্ষণের শেষ নেই। আরও অনেক পরে, বুকে একটু সাহস হলে শরীরটাকে টেনে তুললাম পুকুর থেকে। কিন্তু আবার হুমড়ি খেয়ে পড়লাম একটা গর্তে। হামাগুড়ি দিয়ে ওখান থেকে কোনমতে উঠে এলাম।

অঝোর বৃষ্টি ঝরছে তো ঝরছেই। শীতে রীতিমত কাঁপতে শুরু করেছি আমি। এখন মাথায় একটাই চিন্তা—যেভাবে হোক মেবারিতে আমার বাড়িতে পৌঁছুতেই হবে।

রাস্তায় উঠে একটা বেড়া ধরে ধরে অনেক কষ্টে শরীরটাকে টেনে নিয়ে চললাম। হঠাৎ নরম কিসে যেন হোঁচট খেলাম। বিদ্যুতের আলোয় দেখি কালো জামা আর বুট পরা এক লোক পড়ে আছে বেড়ার নিচে, মাথাটা বেঁকে আছে শরীরের নিচে। লোকটাকে চিৎ করে শোয়ালাম। হার্টবিট পরীক্ষা করতে গিয়ে বুঝলাম মারা গেছে। ঘাড় ভাঙা। লাশটাকে ডিঙিয়ে পাহাড়ের দিকে এগোতে লাগলাম। কোথাও ছিটে ফোঁটা আলো নেই। জ্বলন্ত কিছুও চোখে পড়ল না। শুধু হরশেল খাদের কাছে লালচে ধোঁয়ার একটা রেখা দেখতে পেলাম।

বহু কষ্টে বাড়ি পৌঁছে ভেতরে ঢুকেই বন্ধ করে দিলাম দরজা। পা আর চলে না। সিঁড়ি গোড়ায় ভাঙা 'দ' হয়ে পড়ে গেলাম। ধাতব দানব আর ঘাড় ভাঙা লাশটার কথা মনে আসতেই কাঁপুনি উঠল শরীরে।

কতক্ষণ সিঁড়ির কাছে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ গায়ে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ লাগতেই চোখ মেলে তাকালাম। বৃষ্টির জল ভিজিয়ে দিয়েছে কার্পেট। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম আমি, এগোলাম ডাইনিং রুমের দিকে। এক ঢোক মদ না হলে আর চলে না।

গলা ভেজানোর পর একটু সুস্থ ঠেকল শরীর। শুকনো কাপড় পরে উঠে এলাম দোতলায়, আমার পড়ার ঘরে। জানালা দিয়ে বালিয়াড়ি ঘেরা খাদ এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। ওখানে এখন শুধু উজ্জ্বল একটা লাল আলো জ্বলছে। ধাতব দানবগুলোর কালো কালো ছায়াও চোখে পড়ল। ইতস্তত হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমার বাড়ি থেকে খাদের দূরত্ব মাইল দু'য়েক। তাই বোঝা গেল না ওরা কি করছে।

পাহাড় ছুঁয়ে আমার চোখ চলে গেল মেবারি রোডে, ওকিং স্টেশনের দিকে। ওদিকের গ্রামাঞ্চল দাউদাউ জ্বলছে, রাস্তার ধারে এবং স্টেশনের পাশের সব ঘরবাড়ি পরিণত হয়েছে জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষে। রেল লাইনের ওপর দোমড়ানো মোচড়ানো একটা ট্রেন, জ্বলছে। ওয়াগনগুলো এলোমেলো ছিটিয়ে আছে দূরে।

এই ধ্বংসযজ্ঞ কখন, কিভাবে সংঘটিত হয়েছে জানি না আমি। তবে বুঝতে অসুবিধে হলো না এ জন্য কারা দায়ী।

জানালার দিকে ঘুরে বসলাম এবার। তিনটে ধাতব দানবকে দেখলাম ব্যস্ত। 'কারা ওরা?' ভাবলাম আমি। 'ইন্টেলিজেন্ট মেকানিজম?···অসম্ভব! হয়তো প্রতিটা যন্ত্রের পেটে একটা করে

মার্শিয়ান বসে আছে, তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে যন্ত্রটাকে। যেমন ভাবে মস্তিষ্ক আমাদের শরীর নিয়ন্ত্রণ করে, সেভাবে।'

এই সময় একটা শব্দ হলো আমার বাগানে, বেড়ার ধারে। চট করে নিচে তাকালাম আমি। সৈনিকের পোশাক পরা এক লোক বেড়া বেয়ে উঠছে।

'এই যে,' ফিসফিস করে ডাকলাম আমি।

একটু ইতস্তত করল সৈনিক, তারপর বেড়া টপকে আমার জানালার নিচে এসে দাঁড়াল। ফিসফিস করেই বলল, 'কে ওখানে?'

'লুকোবার জায়গা খুঁজছ?'

'জ্বী, জ্বী।'

'তাহলে ভেতরে এসো।' বলে আমি নিচে গেলাম দরজা খুলতে।

লোকটা ভেতরে ঢুকলে দরজায় আবার খিল লাগিয়ে দিলাম।

'কি হয়েছে বলো তো?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'কি হয়নি তাই বলুন!' হতাশায় হাত ছুঁড়ল সে।

'ওরা আমাদের সাফ করে দিয়েছে—মেরে কেটে স্রেফ সাফ করে দিয়েছে।' ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে পড়ল সৈনিক ধপ করে। হাতে মুখ ঢেকে বাচ্চাদের মত কাঁদতে শুরু করল।

কেঁদে মন হালকা করার সময় দিলাম ওকে। একটু শান্ত হলে বললাম, 'কে তুমি? কোত্থেকে এসেছ?'

'একজন আর্টিলারী ম্যান, স্যার।' ভাঙা গলায় জবাব দিল সে। 'আজ সন্ধ্যা সাতটায় হঠাৎ খবর এল অ্যাকশনে যেতে হবে। কি? না, মার্শিয়ানরা হরশেল খাদ থেকে বেরিয়ে পড়েছে, একযোগে রওনা দিয়েছে আরেকটা সিলিণ্ডারের দিকে। এই সিলিণ্ডারটা আবার ধাতব বর্মে ঢাকা ছিল। এই বর্মটাই হঠাৎ তিন পায়ে দাঁড়িয়ে এক ফাইটিং মেশিনে রূপ নেয়।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'দেখেছি আমি ওটাকে।'

'যাহোক, স্যার, আমার অর্ডার ছিল বালির খাদ লক্ষ্য করে গুলি করা। আমি মাত্র ঘোড়া নিয়ে ছুটতে শুরু করেছি, শয়তানটা ওটার পা টেনে ধরল। আর আমাকে একটা গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। এই সময় আমার পেছনে সশব্দে বিস্ফোরিত হতে শুরু করল বন্দুক, গোলাগুলির শব্দে ভারী হয়ে উঠল বাতাস। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জায়গাটা

একেবারে ম্যাসাকার হয়ে গেল। হঠাৎ দেখি আমি অগ্নিদগ্ধ মানুষ আর মরা ঘোড়ার স্তূপের নিচে পড়ে আছি।'

'মাই গড!' আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। 'তুমি বাঁচলে কি করে?'

'মরার মত পড়েছিলাম,' বলে চলল সে। 'চিন্তাভাবনার শক্তিও হারিয়ে গিয়েছিল। আমরা একেবারেই শেষ হয়ে গেছি। আর ওই গন্ধ—ঈশ্বর! মাংস পোড়ার দুর্গন্ধে ভারী হয়ে উঠেছিল বাতাস। একটা ঘোড়ার লাশের নিচে অর্ধেক শরীর চাপা পড়ে যায় আমার। তারপরও মাথা উঠিয়ে দেখি, আমাদের পদাতিক সৈন্যরা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে ঘটনাস্থলে। তারপর···শিউরে উঠল সৈনিক। 'ঈশ্বর ওদের আত্মাকে শান্তি দিক— ওরা একযোগে ছুটল খাদের দিকে।'

'এই সময় সোজা হয়ে দাঁড়াল দানব—কি বলব, স্যার—ওটা একশো ফুটের চেয়েও উঁচু—তিন ঠ্যাঙে হাঁটতে শুরু করল খাদ পেরিয়ে। ওটার শরীরের ওপরের হুডটা মানুষের মাথার মত ক্রমশ ঘুরে যাচ্ছিল, একটা হাতে ছিল অদ্ভুত দেখতে একটা ধাতব বাক্স। বাক্স থেকে সবুজ আলো বেরুচ্ছিল। হঠাৎ বাক্সটা থেকে ছিটকে এল আলোর একটা রশ্মি, সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেল গোটা পদাতিক বাহিনী। শুধু তাই নয়, রশ্মির আওতায় যেসব গাছপালা, ঝোপঝাড় ছিল সব চোখের পলকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হলো।'

'ওটা নিশ্চই তাপ-রশ্মি!' আঁতকে উঠলাম আমি।

'তবে হরশেল খাদের আশপাশ পুড়িয়েই ক্ষান্ত দিল না দানব, এবার সটান এগোল ওকিং স্টেশনের দিকে। নিমিষে স্টেশনটাকেও ধ্বংস করে দিল সে। মাত্র অল্প ক'জন নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু না পেলেই বরং ভাল হত। কারণ তারা শুধু দৃষ্টিশক্তিই হারায়নি, ঝলসে গেছে সারা দেহ। দানবটাকে দেখলাম একটা লোককে ধাওয়া করে ইস্পাতের শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ফেলল। তারপর গাছের গুঁড়িতে বাড়ি মেরে ভর্তা বানাল। কি ভয়ঙ্কর! দানব দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলে আমি অনেক কষ্টে ঠেলেঠুলে ঘোড়াটাকে সরিয়ে মুক্ত হই।'

'তারপর কোথায় যাচ্ছিলে?'

'আমি এদিকেই আসছিলাম। এখান থেকে লণ্ডন চলে যাব।'

লোকটাকে খুব বিধ্বস্ত আর ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছিল। এদিকে আমারও খিদে পেয়েছিল। আর সময় নষ্ট করলাম না। বসে গেলাম খেতে। তবে

মঙ্গলবাসীরা দেখে ফেলবে এই ভয়ে আলো না জ্বেলেই খাওয়া সারলাম।

পরদিন ভোরে ঘুম ভাঙতেই চোখে পড়ল তিনটে ফাইটিং মেশিন দাঁড়িয়ে আছে খাদের ধারে, হুডগুলো ঘুরছে, যেন গভীর আগ্রহ নিয়ে নিজেদের সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞ দেখছে।

ছয়

বেলা যত বাড়তে লাগল আমাদের মনে ধারণা তত দৃঢ় হলো যে এই বাড়িতে আর বেশিক্ষণ থাকা নিরাপদ নয়। সৈনিকের দলের বেশ কিছু সদস্য মঙ্গলবাসীদের সঙ্গে লড়াইয়ে যোগ দেয়নি, তাদের কাছে ফিরে যাবে, বলল সে। ওদিকে আমিও আমার স্ত্রীকে নিয়ে দেশের বাইরে চলে যাবার তাগিদ অনুভব করলাম। কিন্তু সমস্যা হলো—লেদারহেড যাবার পথ আটকে দাঁড়িয়েছে সেই ভয়ঙ্কর তিন নম্বর সিলিণ্ডার। ওটাকে পাহারা দিচ্ছে একশো ফুট লম্বা দানবগুলো।

খানিকটা পথ দু'জনে একসাথে যাব ঠিক করলাম। তার আগে বিস্কুট, মাংস, হুইস্কি যা পেলাম রান্নাঘর খুঁজে বের করে প্যাকেট করলাম। পথে খেতে হবে তো!

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দ্রুত উঠে এলাম রাস্তায়। তাপ-রশ্মির আঘাতে ছিন্নভিন্ন অসংখ্য লাশ চোখে পড়ল পথে। ঘড়ি, রূপোর চামচ, ক্যাশ বাক্স ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যত্রতত্র। পালাবার সময় ফেলে গেছে লোকজন।

এক ফোঁটা বাতাস নেই কোথাও। বাড়িঘরগুলো জনশূন্য। মানুষজনের বিন্দুমাত্র সাড়া নেই।

বাইফ্লিট গ্রামে পৌঁছে গেলাম ভালয় ভালয়। তাপ-রশ্মির নাগাল থেকে অনেক দূরে থাকলেও গ্রামবাসীরা আতঙ্কে নীল হয়ে আছে। জিনিসপত্র বাঁধা ছাদা করছে, সৈন্যদের দেখলাম তাদের বাক্স-প্যাঁটরা ওয়াগন, ঘোড়ার গাড়ি, যে যেটাতে পারছে তুলে দিচ্ছে।

এক বুড়ো ঝগড়া লাগিয়ে দিল এক কর্পোরালের সঙ্গে, কেন তার

ফুলের টবগুলো সঙ্গে নিতে দেয়া হবে না তাই নিয়ে। বুড়ো একটা বিরাট বাক্সে করে অর্কিডসহ ডজনখানেক ফ্লাওয়ার পট নিয়ে এসেছে।

'তুমি জানো ওদিকের অবস্থা কি সাংঘাতিক? থাকতে না পেরে দৌড়ে গেলাম বুড়োর সামনে। হাত উঁচিয়ে ইঙ্গিত করলাম ওকিং-এর পাইনের জঙ্গলের দিকে।'

'জ্বী?' একটা ফুলের টব দু'হাতে আঁকড়ে ধরে বোকা মুখ করে সাফাই গাইবার চেষ্টা করল সে। 'আমার এই জিনিসগুলো আসলে খুব দামী।'

'ওখানে মানুষ মরছে।' গলা ফাটিয়ে বললাম আমি। 'তোমার কপালেও দুর্ভোগ আছে।' আর কথা বাড়াতে প্রবৃত্তি হলো না। বুড়ো হাঁ করে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি সরে এলাম ওখান থেকে।

রেলওয়ে স্টেশনে এসে দেখি কে কার আগে ট্রেনে উঠবে এই নিয়ে গুঁতোগুঁতি আর ঠেলাঠেলি। অথচ ট্রেনের কোন পাত্তা নেই। পাত্তা মিলবে কিনা তাও সন্দেহ।

বাইফ্লিট গ্রামকে পেছনে ফেলে আমরা টেমস নদীর ওয়েব্রিজের দিকে পা বাড়ালাম। এখানেও একই অবস্থা। ফেরিবোটে সবার আগে ওঠার বিশ্রী প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। চিৎকার আর চেঁচামেচিতে মাথা ধরে গেল।

সব জায়গা থেকে ভয়ার্ত মানুষজন আসছে। সবার হাতে সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। মঙ্গলবাসীদের আক্রমণের ভয়ে সবাই তটস্থ। এক দম্পতিকে দেখলাম তাদের দরজার একটা পাট খুলে এনেছে। তার ওপর থালা, বাটি, গ্লাস, কড়াই, ট্রাঙ্ক আরও কত কি।

হঠাৎ দূরে ভোঁতা একটা আওয়াজ হলো—বন্দুকের শব্দ।

'কিসের শব্দ ওটা?' ডুকরে উঠল আমার পাশের লোকটা। শব্দটা জঙ্গলের দিক থেকে এসেছে বুঝতে পেরে সবাই যেন পাথরের মূর্তি হয়ে গেল।

'আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে ওরা নিশ্চই পারবে না।' মন্তব্য করল এক মহিলা। কিন্তু কথাটা নিজেও যে সে বিশ্বাস করেনি চেহারা দেখে বোঝা গেল।

এই সময় নদীর ওপর দিয়ে ভেসে এল ধোঁয়ার একটা কুণ্ডলী, পরমুহূর্তে মাটি কেঁপে উঠল প্রচণ্ড বিস্ফোরণে। কাছের কয়েকটা বাড়ির

কাঁচের জানালা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

'নির্ঘাত ওরা।' চিৎকার করে উঠল এক লোক। হাত থেকে সুটকেস পড়ে গেল তার। 'ওই তো ওখানে!'

চট করে সেদিকে তাকালাম আমি। নদীর পাড়ে, গাছের মাথা ছাড়িয়ে দৈত্যের মত হাজির হয়েছে চারটে মার্শিয়ান ফাইটিং-মেশিন। লম্বা পা ফেলে এগোতে শুরু করেছে নদীর দিকে। আরও একটা যোগ দিল ওদের সঙ্গে। পঞ্চমটার হাতে একটা বাক্স। সেই ভয়ঙ্কর তাপ-রশ্মি ছোঁড়ার যন্ত্র!

এই অদ্ভুত এবং বিকটদর্শন যন্ত্র দানবদের দেখে নদীর পাড়ের মানুষগুলো মুহূর্তের জন্য যেন বোবা হয়ে গেল। এক সেকেণ্ডের জন্য কোন চিৎকার নেই, আর্তনাদ নেই—আশ্চর্য নীরবতা কেবল—তারপরই ছড়িয়ে পড়ল আতঙ্ক। তাড়া খাওয়া খরগোশের মত ছুটে পালাতে লাগল সবাই। এই বিপদের মধ্যেও বুদ্ধি হারালাম না আমি।

'নদীতে নামো সবাই!' চিৎকার করে কথাটা বলেই দৌড় দিলাম নদীর দিকে। সৈনিকসহ কয়েকজন আমাকে অনুসরণ করল; বাকিরা দিশেহারা হয়ে শহরের দিকে ছুটল।

নদীর জলে মাত্র কোমর পর্যন্ত ডুবল আমার, পায়ে ঠেকল পিচ্ছিল পাথর। মাত্র শ গজ দূরে একটা ফাইটিং-মেশিনকে এদিকে ধেয়ে আসতে দেখে ওই কোমর পানিতেই ডাইভ দিয়ে পড়লাম। অনেকেই আমার দেখাদেখি নদীতে লাফাল। কিন্তু বাকিরা পালাবার জন্য নৌকায় উঠতে শুরু করল।

আধা ডুবন্ত অবস্থায় আমি মাথা তুললাম। একটা ফাইটিং-মেশিন নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছে, তাপ-রশ্মি যন্ত্র উঁচিয়ে ধরে লম্বা পা ফেলে অন্য পাড়ে গিয়ে পৌঁছুল ওটা। ওখানে পৌঁছা মাত্র টেমসের শেপারটন-এর দিক থেকে গর্জে উঠল ছয়টা ভারী কামান। এগুলো জঙ্গলের মধ্যে লুকানো ছিল।

দানব মাত্র তার তাপ-রশ্মি শূন্যে তুলতে শুরু করেছে, এই সময় প্রথম বোমাটা বিস্ফোরিত হলো ওটার মাথায় কয়েক হাত সামনে। আরও দুটো বোমার বিস্ফোরণ ঘটল শরীরের কাছেই। আর চতুর্থ বোমাটা আছড়ে পড়ল ঠিক মুখের ওপর।

ঝলসে গেল ওটার গম্বুজাকৃতির হুড, ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল, চোখ

ঝলসানো লাল আগুনের একের পর এক বিস্ফোরণ শুরু হলো।

'মার শালাকে!' গলা ফাটালাম আমি।

'মার শালাকে! মার!' গর্জে উঠল আমার চারপাশের জনতা।

মুণ্ডুহীন দানব এবার মাতালের মত টলতে লাগল, কিন্তু পড়তে গিয়েও পড়ল না। ভারসাম্য ফিরে পেয়ে ওটা দ্রুত শেপারটনের দিকে এগোল। আমি নিশ্চিত যন্ত্র দানবের হুডের মধ্যে যে মঙ্গলবাসী লুকিয়ে ছিল, সেটা ধ্বংস হয়ে গেছে। ফাইটিং-মেশিন এখন নিছক এক ধাতব দানব ছাড়া কিছু নয়। নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় ওটা শহরের দিকে ছুটে চলল। অন্ধের মত এগোতে গিয়ে ধাক্কা খেল একটা গির্জার চূড়ার সঙ্গে। বন বন করে কয়েকপাক ঘুরে গেল, আশপাশের কয়েকটা দালানের বারোটা বাজিয়ে একসময় সশব্দে আছড়ে পড়ল পানিতে। বিস্ফোরণ হলো নদীতে, ছিটকে উঠল মাটি, বাষ্প আর ধাতব খণ্ড। ওটার বিশাল প্রত্যঙ্গগুলো ঘূর্ণির সৃষ্টি করল পানিতে, ফেণা আর কাদামাটি ঝর্ণার মত উঠতে শুরু করল আকাশে। শুঁড়গুলো মানুষের হাতের মত ঢেউর মধ্যে আঁচড়াল, পাছড়াল, যেন বেঁচে থাকার তীব্র তৃষ্ণায় উন্মাদ।

তাপ-রশ্মির আঘাতে বাষ্পের ধোঁয়া সৃষ্টি হলো নদীতে, পরের মুহূর্তে গরম পানির বিশাল এক ঢেউ আছড়ে পড়ল।

তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল সবাই। এই সময় নদী তীরে অন্য ফাইটিং-মেশিনগুলোকে দেখলাম। লম্বা লাফ মেরে এগিয়ে আসছে। শেপারটন থেকে আবার বোমা ছোঁড়া হলো। কিন্তু এবার ব্যর্থ হলো তারা।

ডুব দিলাম আমি। জলের নিচ দিয়ে এগিয়ে চললাম তীরের দিকে। টের পেলাম জল আরও দ্রুত উষ্ণ হয়ে উঠছে।

শ্বাস নিতে মাথা তুললাম একবার। নদীর উপরে বাষ্পের মেঘ সৃষ্টি হচ্ছে। তারপরও অতিকায় মূর্তিগুলোকে পরিষ্কার চেনা গেল। দুটো যন্ত্রদানব আমার মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। তাদের বিধ্বস্ত সঙ্গীকে গভীর মনোযোগের সাথে দেখল কিছুক্ষণ।

এদিকে নদীর ওপর নারকীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবাসীদের ধাতব শরীরের ঢংঢং, বাড়িঘর গুঁড়িয়ে দেয়ার কানে তালা লাগানো শব্দ, গাছ-পালা পোড়ার কান ফাটানো শোঁ শোঁ, আর আগুনের গর্জন—সব মিলে এক ভয়াবহ দৃশ্য। আর তাপ-রশ্মি ওয়েব্রিজের এক দিকের নদীতে

বারবার ঝলসে উঠছে।

প্রায় ফুটন্ত, বুক সমান জলে আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। পালাবার পথ দেখছি না। লোকজন উঁচু পাথর বেয়ে ব্যাঙের মত লাফিয়ে পড়ছে তীরের জঙ্গলে।

হঠাৎ তাপ-রশ্মির সাদা শিখা বিদ্যুৎগতিতে আমার দিকে ছুটে এল। তীরের কাছে যে সব বাড়িঘর তখনও খাড়া ছিল, চোখের পলকে সেগুলোতে আগুন ধরে গেল। নদীর ধারে আসার রাস্তাটিকেও ছুঁয়ে গেল মৃত্যু-রশ্মি। রাস্তা দিয়ে যারা ছুটছিল সবাই সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, সেখান থেকে পঞ্চাশ হাতেরও কম দূরত্বে এসে আছড়ে পড়ল ওটা। সৃষ্টি করল ফুটন্ত বাষ্পের এক চুড়ো।

তীরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, মাত্র সাঁতার শুরু করেছি, ফুটন্ত জলের বিশাল এক ঢেউ সবেগে ধেয়ে এল আমার দিকে।। ব্যথা আর যন্ত্রণায় বুক ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি। গরম জলে ঝলসে গেছে শরীর। তবুও কোনমতে দেহটাকে সৈকতের বালুর ওপর টেনে তুললাম। মঙ্গলবাসীরা যে আমাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে ব্যাপারে আমার কোনই সন্দেহ নেই। অবধারিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া এখন কোন উপায় নেই।

আমার অস্পষ্ট মনে আছে এক মঙ্গলবাসীর পায়ের শব্দ আমি পাই খুব কাছেই। ধোঁয়ার মধ্য থেকে দেখি চার যন্ত্রদানব তাদের মৃত সঙ্গীকে নদী থেকে তুলে নিল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল একটা তৃণভূমির আড়ালে। আর আমিও বেঁচে গেলাম অলৌকিক ভাবে!

সাত

মানুষজনের কোথাও কোন চিহ্ন না দেখে উঠে দাঁড়ালাম আমি। ওয়েব্রিজের জ্বলন্ত ধ্বংসাবশেষ আর বিধ্বস্ত শেপারটনকে পেছনে রেখে নদীর তীর বরাবর যাত্রা শুরু করলাম লণ্ডনের দিকে।

ভাটির কাছে একটা পরিত্যক্ত নৌকা দৃষ্টি কাড়ল আমার। জামাকাপড় খুলে লাফিয়ে পড়লাম জলে। নৌকায় বৈঠা নেই। অগত্যা

ফোসকা পরা হাত দুটোকেই বৈঠা বানালাম। ঠিক করলাম এভাবে যতদূর যাওয়া যায় যাব।

নদীর দুই পাড়ে বিরান জনভূমি। নদীর দিকে মুখ করা বাড়িগুলোতে এখনও আগুন জ্বলছে।

অনেকক্ষণ বৈঠা বাওয়ার পর হাত দুটো ব্যথায় বিষ হয়ে গেল। সূর্য আমার পিঠ ঝলসে দিচ্ছে। কিন্তু দানবগুলোর কথা মনে পড়তে আবার বাইতে শুরু করলাম। বিকেল পাঁচটার দিকে একেবারে এলিয়ে পড়লাম। ওয়ালটন গ্রামের কাছে এসে থামালাম নৌকা।

নদী তীরের লম্বা ঘাসের আড়ালে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি, হাঁটা শুরু করলাম। একা একা আবোল তাবোল বকছি, কি বলছি নিজেই জানি না। হাঁটতে হাঁটতে তেষ্টায় বুক ফেটে গেল। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে বসে পড়লাম একটা ফণিমনসার ঝোপের নিচে। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে কখন বুজে এসেছে চোখ জানি না।

সূর্য অস্ত যাবার সময় ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম আমি। আমার পাশে বসে আছে এক লোক, চেয়ে আছে লালচে-বেগুনী আকাশের দিকে। 'একটু জল খাওয়াতে পারবে, ভাই?' লোকটাকে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'একেবারে শেষ মুহূর্তে তুমি জল খেতে চাইলে, ভাই। আমার কাছে এক ফোঁটা জলও নেই।'

লোকটার দিকে এই প্রথম ভাল করে তাকালাম। গির্জার পাদ্রীদের মত পোশাক তার পরনে, কিন্তু কাল চোখের শূন্য দৃষ্টি দেখে মনে হলো এই লোকের ওপর খুব একটা ভরসা করা যায় না।

'ঈশ্বর কেন এই ঘটনাগুলো ঘটতে দিচ্ছেন?' ভীত গলায় প্রশ্ন করল সে। 'আমরা এমন কি পাপ করেছি? আমি মাত্র ভোরের প্রার্থনা সেরে হাঁটতে বেরিয়েছি হঠাৎ—ওহ্ ঈশ্বর! কেয়ামত নেমে এল যেন দুনিয়ায়। চারদিকে আগুন, ভূমিকম্প আর মৃত্যু! সবকিছু শেষ হয়ে গেছে আমার—আমার চার্চ, রোববারের স্কুল সবকিছু!'

রীতিমত বিলাপ শুরু করল পাদ্রী। সব কিছুর জন্য একভাবে ঈশ্বরকে দায়ী করে যেতে লাগল।

'এত ভেঙে পড়লে চলবে না,' নরম গলায় বললাম আমি, 'আশায় বুক বাঁধো। আশা নিয়েই তো বেঁচে থাকা।'

'আর আশা!' গুঙিয়ে উঠল সে। 'এ হলো কেয়ামতের শুরু।'

আমি বেশ কষ্টে শরীরটাকে টেনে তুললাম। পাদ্রীর কাঁধে হাত রেখে বললাম, 'অত ভয় পেলে চলে না। ভূমিকম্প, বন্যা, যুদ্ধ, অগ্নিগিরি এর আগেও বহুবার মানুষকে গ্রাস করেছে। কিন্তু তারপরও মানুষ আশা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।'

'কিন্তু আমরা কি রক্ষা পাব?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল সে। 'ওই ভয়ঙ্কর প্রাণীগুলোর যেন কোনও ধ্বংস নেই!'

'ওদের ধ্বংস নেই কে বলল?' বললাম আমি। 'এই তো ঘণ্টা তিনেক আগে একটা কুপোকাৎ হলো। কিন্তু ওরা আবার আসবে। এবার সম্ভবত ওদের টার্গেট হবে লণ্ডন। আমি ওদিকেই যাচ্ছি। আমার সঙ্গে গেলে চলো।'

আট

আমার ছোট ভাই ফ্রাঙ্ক মেডিকেলে পড়ে, মঙ্গলবাসীদের ওকিং-এ অবতরণের সময় লণ্ডনে সে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। শনিবারের খবরের কাগজে মার্শিয়ানদের সিলিণ্ডারের কথা পড়লেও ব্যাপারটাকে তেমন গুরুত্ব দিল না ফ্রাঙ্ক। কারণ ও জানে আমাদের বাড়ি হরশেল খাদ থেকে মাইল দু'য়েক দূরে। তাছাড়া পরদিনই সে মেবারিতে আসার প্ল্যান করেছিল।

পরদিন, অর্থাৎ রোববার লণ্ডনের ওয়াটার লু স্টেশনে এসে ফ্রাঙ্ক দেখে ওকিং-এ সেনাবাহিনী আর সাপ্লাই পাঠানোর জন্য পুলিশ সাধারণ যাত্রীদের ট্রেনে উঠতে দিচ্ছে না। স্টেশনের পাশে, রাস্তার ধারে হকার ছেলেগুলোর চিৎকার ওর মনোযোগ কাড়ল। একটা ছেলে একটা খবরের কাগজ উঁচিয়ে ধরে তারস্বরে চিৎকার করে চলেছে, 'ভয়ঙ্কর বিপর্যয়! ওয়েব্রিজে রোমহর্ষক লড়াই! হাজার হাজার খুন!'

ব্যাপারটা উপলব্ধি করে গা ঠাণ্ডা হয়ে এল ফ্রাঙ্কের। তাহলে মঙ্গলবাসীরাই ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে ওখানে!

যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকা থেকে পালিয়ে আসা লোকজন ইতিমধ্যে শহরে ঢুকে পড়তে শুরু করেছে। তারা আসবাব পত্র, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস

ইত্যাদি গাড়ি বোঝাই করে নিয়ে আসছে। যাত্রীদের সবার মুখ পাণ্ডুর, সব হারানোর বেদনায় মুহ্যমান। ভীত এবং আতঙ্কিত এই মানুষগুলো লণ্ডনের কেতাদুরস্ত লোকজনের পাশে বড়ই বেমানান। শহরে এসে এরা উত্তেজিত ভাঙ্গিতে অন্যদের কাছে তাদের অভিজ্ঞতার কথা বলতে শুরু করল।

'আমি নিজের চোখে মঙ্গলবাসীদের দেখেছি,' হাত পা ছুঁড়ে বলল ময়লা পোশাক পরা এক উদ্বাস্তু। 'রণ-পা পরেছিল সব ক'টা। কি লম্বা! আকাশ ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। আবার মানুষের মত হাঁটছিল।'

ফ্রাঙ্ক এই উদ্বাস্তুদের অনেকের কাছেই আমার কথা জিজ্ঞেস করল। একজন তাকে জানাল গত রাতে ওকিং-কে মার্শিয়ানরা ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

ভয়ানক চিন্তিত হয়ে পড়ল ফ্রাঙ্ক। কিন্তু নতুন কোন খবর যদি পাওয়া যায় এই আশায় বাসায় ফিরে এল সে। পরদিন সকালে ওর ঘুম চটকে গেল দরজায় ধাক্কাধাক্কির শব্দে।

চিলেকোঠার ঘর থেকে নিচে তাকাল ফ্রাঙ্ক। পুলিশ! দরজায় ধাক্কা মেরে বলছে, 'মঙ্গলবাসীরা আসছে! সাবধান!' এই সময় গির্জার সবগুলো ঘণ্টা প্রচণ্ড শব্দে বাজতে শুরু করল। ঘণ্টার আওয়াজে যারা ঘুমিয়েছিল তারাও উঠে পড়ল। বোঁচকা বুঁচকি বেঁধে খেয়ে না খেয়ে সবাই ছুটল রেল স্টেশনের দিকে। লণ্ডন ছেড়ে পালাবে।

ফ্রাঙ্কও আর দেরি করল না। চটপট পোশাক পরে রাস্তায় নেমে পড়ল। এত ভোরে লণ্ডনের রাস্তায় হকারদের কখনও দেখেনি ফ্রাঙ্ক। কিন্তু আজ তারা সাত সকালেই খবরের কাগজ নিয়ে ছোটাছুটি শুরু করেছে আর বলছে, 'লণ্ডনের এখন শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা! এগিয়ে আসছে মঙ্গলবাসীরা! টেমস উপত্যকায় ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞ!' ফ্রাঙ্ক তাড়াতাড়ি একটা কাগজ কিনে তাতে চোখ বুলাতে লাগল। প্রথম পাতাতেই আর্মির কমান্ডার-ইন-চিফের বক্তব্য:

মঙ্গলবাসীদের নিক্ষিপ্ত রকেটে বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। লণ্ডনের দিকে আমাদের যে সব সৈন্য আসছিল তারা সবাই দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে। এই কালো ধোঁয়া পথে যা পাচ্ছে সব ধ্বংস করে এগিয়ে আসছে। মঙ্গলবাসীদের ঠেকাবার সাধ্য আমাদের নেই। কালো ধোঁয়ার

কবল থেকে রক্ষা পেতে তাৎক্ষণিকভাবে পালানো ছাড়া আর কোনও উপায়ও নেই।

এই হলো খবর। কিন্তু এই ছোট্ট খবরটাই লণ্ডনের ষাট লাখ নগরবাসীকে আতঙ্কিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট।

বিপদের মাত্রা বুঝে তক্ষুণি রাসায় ফিরে এল ফ্রাঙ্ক। টাকা-পয়সা যা ছিল সব নিয়ে আবার নেমে পড়ল রাস্তায়।

নয়

লণ্ডনে সেদিন কি ঘটেছিল সব কথা আমি পরে শুনেছি। ফণিমনসার ঝোপের নিচে বসে আমি যখন পাদ্রীর সঙ্গে কথা বলছি ঠিক ওই সময় মঙ্গলবাসীরা আরেকটি আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। ওইদিন ছিল রোববার, ভোর বেলা।

সকাল আটটার দিকে তিনটে ফাইটিং-মেশিন তাদের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে লাইন ধরে এগোল লণ্ডনের দিকে। সাইরেন আর নেকড়ের গর্জন—এই দুইয়ের সমন্বয়ে এক অদ্ভুত 'ভাষা'য় ওরা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছিল।

নতুন পদাতিক বাহিনী ওদের ঠেকাবার কোন সুযোগই পেল না, এলোপাতাড়ি বোমা ছুঁড়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে গেল তারা, কিন্তু একটা ধাতব দানব তাপ-রশ্মি ছুঁয়েও দেখল না স্রেফ পায়ের চাপে ভর্তা বানিয়ে ফেলল ওদেরকে ভারী কামানসহ।

সেন্ট জর্জ হিলে পৌঁছে এই দানব প্রথম বারের মত বাধার মুখে পড়ল। এক হাজার গজ দূর থেকে বিস্ফোরিত হলো কামান, বৃষ্টির মত গোলার একটা আঘাত করল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে একটা পা উড়ে গেল। মুখ দিয়ে অদ্ভুত সেই নেকড়ের ডাক বেরিয়ে এল তার, টলে উঠল, তারপর বিশাল দেহ নিয়ে দড়াম করে পড়ে গেল মাটিতে। ইতিমধ্যে অন্য ফাইটিং-মেশিনগুলো এসে পড়েছে তাদের সঙ্গীদের কাছে। সৈন্যদের লক্ষ্য করে তাপ-রশ্মি ছুঁড়ল তারা। বিস্ফোরিত হলো বারুদ, আগুন ধরে গেল পাইনের সারিতে। মাত্র অল্প কয়েকজন সৈনিক প্রাণ নিয়ে পাহাড়ের নিচে পালাতে পারল।

তিন ফাইটিং-মেশিন এবার এক সারিতে প্রায় আধঘণ্টার মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা আরেকটা মেশিনের হুড ভেদ করে বেরিয়ে এল বাদামী রঙের বিকট চেহারার এক মঙ্গলবাসী। এক সেকেণ্ডও দেরি করল না। সঙ্গে সঙ্গে মেশিনের ভাঙা অংশ জোড়া লাগানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

কাজ শেষ হলে স্থির যন্ত্র-দানবদের মধ্যে দেখা দিল প্রাণ চাঞ্চল্য। একটু পরে আরও আটটা দানব এসে যোগ দিল তাদের সঙ্গে। এরা প্রত্যেকেই অনেকগুলো মোটা, কালো রঙের টিউব বহন করছে। টিউবগুলো বাকি তিন সঙ্গীর মধ্যে বিলি করে দেয়া হলো। তারপর সার বেঁধে আবার যাত্রা শুরু করল চলমান পাহাড়গুলো।

পাদ্রীকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছি, হঠাৎ দুই ফাইটিং-মেশিনকে দেখলাম মাঠ পেরিয়ে আমাদের দিকে আসছে। গলা চিরে ভয়ার্ত আর্তনাদ বেরিয়ে এল পাদ্রীর, ঘুরে দাঁড়িয়েই দিল দৌড়।

'দৌড়ে পালাতে পারবে না,' পেছন থেকে ডাকলাম আমি। 'বাঁচতে চাইলে আমার সঙ্গে এসো। ঝোপের আড়ালে লুকাব।'

আমার পরামর্শ কানে ঢুকল ওর। ফিরে এল। ফণিমনসার ঝোপের কাছে একটা গর্ত মত। ওদিকে দু'জনে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলাম। দুই মঙ্গলবাসী আমাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। অবস্থান নিল লম্বা রাস্তাটার ঠিক মোড়ের সামনে। রাস্তার পাশেই জঙ্গলে আরেকদল সৈন্য নীরবে ওদের আগমনের অপেক্ষায় ছিল।

আমাদের আশ্রয়স্থল অর্থাৎ গর্তটার মুখ ঢেকে আছে ঝোপঝাড়ে। ঝোপের ফাঁক ফোকর দিয়ে মাত্র উঁকি দিয়েছি, এইসময় দূরে বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলাম। পরের শব্দটা বেশ কাছ থেকে হলো। আমাদের কাছে দাঁড়ানো মঙ্গলবাসী তার কালো টিউবটা শূন্যে তুলে ধরল, তারপরই সানবারি গ্রামের দিকে বন্দুকের মত ওটার বিস্ফোরণ ঘটল। বিস্ফোরণের ধাক্কায় কেঁপে উঠল মাটি। কিন্তু আলোর কোন ঝলকানি নেই, নেই ধোঁয়ার উদগীরণ, শুধু বিস্ফোরণের প্রবল শব্দ। রাস্তার বাঁক থেকে দূরে দাঁড়ানো আরেক মঙ্গলবাসীও একই রকম বিস্ফোরক ছুঁড়ল।

এমন অদ্ভুত অস্ত্র জীবনে দেখিনি আমি। উত্তেজনায় নিজেদের নিরাপত্তার কথা বেমালুম ভুলে হুড়মুড়িয়ে উঠে এলাম গর্তের ওপরে।

টিউবগুলো কিভাবে কাজ করে তাই ভাল করে দেখব। মাত্র গর্তের মুখে উঠেছি, দিড়িম করে সানবারি গ্রামের কোথায় যেন আরেকটা বিস্ফোরণ হলো। ধোঁয়া কিংবা আগুনের চিহ্ন দেখলাম না এবারেও। এক মিনিট...দু'মিনিট...

হঠাৎ দূরে একসঙ্গে কারা যেন চিৎকার করে উঠল, পরক্ষণে সব চুপ। বুকে ঢিপঢিপানি নিয়ে আমি সময় গুণে চলেছি। কখন আবার সেনাবাহিনীর কামান কিংবা বন্দুক গর্জে ওঠে সেই আশায়। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

পাদ্রীকে নিয়ে মঙ্গলবাসীদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে একটা পাহাড়ে উঠলাম সানবারি গ্রামের অবস্থা দেখতে। একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে ঢুকে ওপর তলার জানালা দিয়ে নিচের গ্রামের দিকে তাকালাম। মোচার মত কতগুলো পাহাড় হঠাৎই যেন দূরে গজিয়ে উঠেছে। বিস্মিত হয়ে দেখলাম পাহাড়গুলো যেন ছোট আর চওড়া হতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে আরও ক'টা পাহাড় গজিয়ে উঠল চোখের সামনে। বুঝতে পারলাম মঙ্গলবাসীরা তাদের যেসব কালো টিউব ছুঁড়ছে, ওগুলো আসলে একেকটা কেনেস্তারা বা পেটি। কেনেস্তারাগুলো মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরিত হয়েছে, গলগল করে বেরিয়ে এসেছে কালো গ্যাস। এই গ্যাস পর মুহূর্তে পাহাড়-আকৃতির মেঘে রূপ নিয়েছে, তারপর ধোঁয়া হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গ্রামাঞ্চলে। এই কালো ধোঁয়া যার নাকে গেছে সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে সে। কারণ এটা ভয়ানক বিষাক্ত একটা গ্যাস। ফুসফুসে যাওয়া মাত্র দম বন্ধ হয়ে তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটেছে হতভাগ্যদের।

বিষাক্ত ধোঁয়ার আক্রমণেই মানুষজন হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল। পরক্ষণে শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা গেছে সবাই। এর কারণেই সেনাবাহিনী আর একটা গুলিও ছোঁড়ার সুযোগ পায়নি। তার আগেই তাদেরকে গ্রাস করেছে কালো মৃত্যু।

তবে কালো ধোঁয়ার বিস্তৃতি মাটির খুব কাছাকাছি ছিল বলে ওই সময়ে যারা বাড়ির ছাদে কিংবা গাছের মগডালে লুকাতে পেরেছে, শুধু তারাই প্রাণে বেঁচে গেছে। কালো ধোঁয়া ছুঁড়ে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে দেখে মঙ্গলবাসীরা দূষিত বাতাস পরিষ্কার করে ফেলল বাষ্প ছড়িয়ে। জানালা দিয়ে আমরা দু'জন চেয়ে দেখলাম আশপাশের অঞ্চলগুলোতে

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

শুভম ক্রিয়েশন

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ

স্ক্যানিং
এডিটিং

শুভম

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

আবার বিষাক্ত গ্যাস ছড়াতে ছড়াতে মঙ্গলবাসীরা সোজা লণ্ডন শহরের দিকে এগোতে শুরু করেছে।

সেন্ট জর্জ হিল-এ আহত হবার তিক্ত অভিজ্ঞতা আরও সতর্ক করে তুলেছিল মঙ্গলবাসীদের। সেনাবাহিনীকে আক্রমণের আর কোন সুযোগই তারা দিল না। আশপাশে সৈন্য লুকিয়ে আছে, ঘুণাক্ষরে এমন সন্দেহ জাগলেও মঙ্গলবাসীরা বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে দিল। আর দৃষ্টিসীমায় কোন বন্দুকের নল দেখতে পেলেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে নির্মমভাবে তাপ-রশ্মি ব্যবহার করতে কসুর করল না তারা।

সূর্য ওঠার আগেই, লণ্ডনের বাইরে রিচমণ্ড শহরে পৌঁছে গেল মঙ্গলবাসীরা। যত্রতত্র ছুঁড়তে লাগল কালো ধোঁয়ার শেল। নিরুপায় হয়ে একসময় সরকার ঘোষণা করলেন অবিলম্বে নগরবাসীকে লণ্ডন ত্যাগ করতে হবে!

দশ

সোমবার সকালে বিভীষিকার একটা ঢেউ যেন আছড়ে পড়ল লণ্ডন শহরে। রেলওয়ে স্টেশন, জাহাজ ঘাটা, প্রতিটি রাস্তার মোড়ে আতঙ্কিত মানুষের ঢল নামল।

দুপুরের দিকে রেল স্টেশনগুলোতে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল সম্পূর্ণভাবে। বেলা দুটোর সময় দেখা গেল গাড়িতে পা রাখার জায়গাটুকুর জন্য হিংস্র হয়ে উঠেছে মানুষ। তিনটার দিকে অবস্থার আরও অবনতি হলো। উন্মত্ত জনতাকে শান্ত রাখতে বৃথাই রিভলভার ছুঁড়ল পুলিশ। ভিড়ের চাপে পিষে গেল অনেকেই, ছুরি খেয়েও কেউ কেউ পড়ে গেল রাস্তায়। ট্রাফিক পুলিশ বিধ্বস্ত আর ক্রুদ্ধ হয়ে হাতাহাতি শুরু করল জনতার সাথে।

ট্রেনের গার্ড আর ড্রাইভাররা হাঁপিয়ে উঠল ভিড়ের চাপে। শেষ পর্যন্ত তারা খালি ট্রেন নিয়ে লণ্ডনে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। লোকজন তারপরও উত্তর দিকের রাস্তা লক্ষ্য করে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। কারণ ওদিক থেকেই ট্রেন ছাড়ছে।

আমার ভাই ফ্রাঙ্ক চকফার্ম স্টেশনে গিয়ে খামোকা চেষ্টা করল ট্রেনে

চাপতে। একটা ট্রেন মাত্র স্টেশন ছেড়ে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু পচা মাংসের ওপর ছেঁকে থাকা মাছির মত মানুষের ভিড়ে ফ্রাঙ্ক ট্রেনের কাঠামোটাই দেখতে পেল না, ট্রেনে চড়বে কি! অগত্যা হেঁটেই যাবে ঠিক করল সে।

একটার পর একটা গ্রাম পেরিয়ে যাচ্ছে ফ্রাঙ্ক, রাস্তা-ঘাটের দোকানপাটগুলো দেখল খোলা। বারান্দা, দরজার চৌকাঠে, জানালায় লোকজন সব হাঁ করে তাকিয়ে আছে লণ্ডন থেকে পালিয়ে আসা আশ্রয়হীন মানুষগুলোর দিকে। বাইসাইকেল, মটর গাড়ি, ক্যাব, ঘোড়ার গাড়ি সব রকম যানবাহনে মিছিল করে আসছে তারা।

'আগে বাড়ো!' চিৎকার করছে পলায়নপর মানুষগুলো।

'শিগগির আগে বাড়ো! ওরা আসছে!'

কে কার আগে যাবে এই নিয়ে ড্রাইভারদের সঙ্গে ঝগড়া; কয়েকজন শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল অনন্ত আকাশের দিকে; কেউ কেউ প্রবল হতাশায় শুয়ে পড়ল তাদের ওয়াগনের নিচে। যাত্রী টানতে গিয়ে ঘোড়াগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা উঠে গেল, চোখ রক্ত লাল।

ফ্রাঙ্ককে পাশ কাটিয়ে দামী পোশাক পরা শহুরে নাগরিকরা ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকের চেহারায় অদ্ভুত বিষণ্ণতা। তাদের বাচ্চারা কাঁদছে, ফুলে গেছে মুখ। বহুমূল্য পোশাক ধুলোয় নোংরা। আহত সৈন্যরাও সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক কাতারে ছুটে চলেছে। তৃষ্ণায় তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে, পা মোটেও চলছে না। কিন্তু তারপরও কেউ একদণ্ড বিশ্রাম নিতে রাজি নয়। মঙ্গলবাসীদের ভয় দুঃস্বপ্নের মত তাড়া করছে তাদেরকে।

'পথ ছাড়ো! পথ ছাড়ো! মঙ্গলবাসীরা হামলা করতে আসছে!' কতগুলো দুর্বল কণ্ঠ চেঁচিয়ে উঠল ভিড়ের মধ্য থেকে।

ফ্রাঙ্কের সঙ্গে দাড়িওয়ালা, তীক্ষ্ণ চেহারার এক লোক হেঁটে আসছিল অনেকক্ষণ ধরে, হাতে একটা ছোট থলে। হঠাৎ থলেটা কিভাবে যেন ফেঁসে গেল, ঝনঝন শব্দে রাস্তায় পড়ে গেল অনেকগুলো ঝকঝকে স্বর্ণমুদ্রা। ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে, লোকজন আর ঘোড়াগুলোর পায়ের নিচে। থমকে দাঁড়াল লোকটা, হাঁ হয়ে গেল মুখ, চোখে নিখাদ বিস্ময়। ঠিক এই সময় পেছন থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি ধাক্কা দিল তাকে, ছিটকে রাস্তার কিনারে পড়ে গেল সে।

গাড়িটা চলে যেতেই দাড়িওয়ালা হাঁ হাঁ করে ছুটে এল, ছড়িয়ে থাকা মুদ্রাগুলো লোভীর মত টপাটপ কুড়িয়ে পকেটে ঢোকাতে শুরু করল। আর তখন ঘটল আরেক বিপদ। টাকা কুড়াতে ব্যস্ত ছিল বলে পেছনে নজর ছিল না লোকটার, কোত্থেকে একটা ঘোড়া এসে হুড়মুড়িয়ে পড়ল তার গায়ে।

'থাম! থাম!' চেঁচিয়ে উঠল ফ্রাঙ্ক, ঘোড়ার লাগাম ধরতে যাচ্ছে, তার আগেই মরণ আর্তনাদ করে উঠল দাড়িওয়ালা। ঘোড়ার গাড়ির চাকার নিচে চাপা পড়েছে সে। পিঠের ওপর দিয়ে চলে গেছে চাকা।

ফ্রাঙ্ক আহত লোকটাকে সাহায্য করার জন্য দৌড়ে গেল। কিন্তু দেখল শিরদাঁড়া ভেঙে গেছে তার, পা নাড়াতেও পারছে না।

'আমাকে একটু সাহায্য করুন, ভাই,' এক ঘোড়সওয়ারকে ডেকে বলল ফ্রাঙ্ক। 'লোকটাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাই।'

আহত লোকটাকে জ্যাকেট ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল ওরা দু'জন। লোকটা তখনও রাস্তা থেকে স্বর্ণমুদ্রা কুড়োতে ব্যস্ত!

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে তাল সামলাতে না পেরে আরেকটা গাড়ির ওপর আছড়ে পড়ল। দ্বিতীয় গাড়ি তার ঘোড়াসুদ্ধ ডিগবাজি খেয়ে পড়ল ফ্রাঙ্কদের ওপর। এক চুলের জন্য গাড়ির নিচে চাপা পড়ল না ফ্রাঙ্ক, কিন্তু দাড়িওয়ালা লোকটা মাটির সঙ্গে যেন পিষে গেল বনবন করে ঘুরতে থাকা ভারী কাঠের চাকার আঘাতে।

আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় অনেকক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে থাকল ফ্রাঙ্ক। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার সঙ্গী হলো সে জনতার। বেশ কয়েকঘণ্টা যাত্রার পর অনেকগুলো রাস্তার এক সঙ্গমস্থলে হাজির হলো সে। এখানে এসে জনতার ভিড় বিভিন্ন দিকে ভাগ হয়ে গেল। পুবদিকের রাস্তা ধরল ফ্রাঙ্ক।

সন্ধ্যা পর্যন্ত একভাবে হেঁটেই চলল সে। ক্ষুধা আর তৃষ্ণায় শরীর কাহিল। ক্লান্তিতে পা আর চলে না। হাত পা ছড়িয়ে ঘুমাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সাহস হলো না। বিশ্রামের জন্য একটু থামল ফ্রাঙ্ক। শূন্য দৃষ্টিতে দেখল প্রাণভয়ে ভীত মানুষের অনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটে চলা। খাদ্য নেই, আশ্রয় নেই, নিরস্ত্র আর অসহায় লণ্ডনের ষাট লাখ মানুষ দিশেহারা হয়ে ছুটে চলেছে কোন্ অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে কেউ জানে না।

এগারো

ইতিহাসের বৃহত্তম ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে চালাতে লণ্ডনের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল মঙ্গলবাসীরা। সারা দেশে বিষাক্ত কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে তারা নির্বিচারে হত্যা করে চলল হাজার হাজার মানুষ। গান পাউডারের স্টোর উড়িয়ে দিল, উপড়ে ফেলল টেলিগ্রাফ লাইন, লোহার স্তূপে পরিণত করল রেলওয়ে। ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে ওরা। কোনও তাড়া নেই। সমস্ত বাধা প্রতিহত করার দুর্বার ক্ষমতা আর দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মঙ্গলবার ভোরে মঙ্গলবাসীরা লণ্ডনের মূল কেন্দ্রে ঢুকে পড়ল। যারা ঘর বাড়ি ছেড়ে তখনও যায়নি, বিষাক্ত ধোঁয়ার আক্রমণে শ্বাস বন্ধ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল তারা।

দুপুরের দিকে টেমস নদীতে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। বন্দরে নোঙর করা স্টিমার আর জাহাজে লাফিয়ে ওঠার চেষ্টা করছে শত শত মানুষ। মঙ্গলবাসীদের ভয়ে ওরা সবাই ঘর পালিয়ে এসেছে। কেউ কেউ নৌকায় উঠতে লাগল। অনেকে এর কোনটাতে ওঠার সুযোগ না পেয়ে নেমে পড়ল নদীতে। সাঁতার কাটতে গিয়ে এদের মধ্যে আবার অনেকের সলিল সমাধি ঘটল।

বেলা একটার দিকে ব্লাকফ্রেয়ারস ব্রিজের চুড়োয় ঘন কাল ধোঁয়ার একটা মেঘ ভেসে এল। ওই জায়গাটার ওপর তখন নরক ভেঙে পড়েছে। টাওয়ার ব্রিজের নিচে আটকা পড়ল অগণিত নৌকা আর স্টিমার। ব্রিজের ওপর থেকে যারা নৌকায় লাফিয়ে নামার চেষ্টা করল তাদের সঙ্গে নাবিকদের রীতিমত মারামারি শুরু হয়ে গেল। চিৎকার, হল্লা আর আর্তনাদ মিলে সে এক ভয়াবহ অবস্থা।

বেলা ঠিক দুটোর সময় ক্লক টাওয়ারকে পেছনে ফেলে নদীর দিকে এগিয়ে গেল বিশালদেহী এক মঙ্গলবাসী। দুই তীরে রেখে গেল ভয়ঙ্কর ধ্বংসযজ্ঞের ভয়াবহ নিদর্শন।

বারো

অনেকদিন হেঁটে, পথে সামান্য বিশ্রাম নিয়ে অবশেষে টিলিং-হ্যাম-এর সমুদ্র বন্দরে পৌঁছুল ফ্রাঙ্ক। তীরে প্রতিবেশী দেশের অসংখ্য মাছ ধরার জাহাজ, স্টিম লঞ্চ, ইয়ট, ইলেকট্রিক বোট, সওদাগরী জাহাজ, যাত্রী জাহাজ, অয়েল ট্যাঙ্কার ইত্যাদি বহু জলযান নোঙর করে আছে। মাইল খানেক দূরে আগাগোড়া লোহায় মোড়া যুদ্ধ জাহাজ 'থাণ্ডার চাইল্ড'কে চোখে পড়ল ফ্রাঙ্কের। ওটার পেছনে এক লাইনে ভেসে আছে বৃটিশ নৌবাহিনীর আরও কিছু যুদ্ধজাহাজ। সবগুলো অ্যাকশনে যাবার জন্য প্রস্তুত।

তীরে নেমে এল ফ্রাঙ্ক! হাত নেড়ে একটি স্টিমারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। একটা নৌকা পাঠিয়ে দেয়া হলো ওর জন্য। বারো পাউণ্ড ভাড়া দাবি করল ওরা ফ্রাঙ্ককে বেলজিয়ামের অসটেণ্ডে পৌঁছে দেয়ার জন্য। রাজি হয়ে গেল ফ্রাঙ্ক। চড়ে বসল নৌকায়। ডেকে বসার জায়গাও পেল। খাবার কিনতেও ওকে পকেট থেকে মোটা অঙ্কের টাকা খসাতে হলো।

বিকেল পাঁচটা বেজে গেল, তারপরও স্টিমার ছাড়ার কোন লক্ষণ নেই। ডেকে পা ফেলার জায়গাও নেই। ক্যাপ্টেন বোধহয় তার জলযানের মুশকো পেটে আরও যাত্রী ঢোকাবার তালে ছিল। কিন্তু, দক্ষিণ দিক থেকে ভেসে আসা বন্দুকের আওয়াজে পিলে চমকে গেল তার। আওয়াজটা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। একটু পরেই ফ্রাঙ্ক দেখল দূরে ধোঁয়ার রেখা উঠতে শুরু করেছে। তিনটে যুদ্ধ জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে গেল ধোঁয়ার উৎসমুখের সন্ধানে।

অবস্থা বেগতিক বুঝে ক্যাপ্টেনও স্টিমার ছেড়ে দিল। তীরের জাহাজের দঙ্গল থেকে বেরিয়ে ওটা সোজা পুবদিকে ছুটতে শুরু করল। মাত্র খোলা সাগরে এসেছে এই সময় সমুদ্র সৈকতে বিশাল বপু নিয়ে হাজির হলো এক মার্শিয়ান ফাইটিং মেশিন। কিলিং মেশিনটাকে দেখে মনে মনে প্রমাদ গুণল ক্যাপ্টেন। নিজেকে অভিশাপ দিল কেন দেরি করে স্টিমার ছেড়েছে। ডকের রেলিং-এ ভর দিয়ে যাত্রীরা বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল দূরের পর্বত প্রমাণ আকৃতিটির দিকে। ওটার

উচ্চতা গাছ এবং চার্চের টাওয়ার ছাড়িয়েছে। যন্ত্রদানব হেলেদুলে এগিয়ে আসতে লাগল। যেন হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

জীবনে এই প্রথম সামনা সামনি কোন মঙ্গলবাসীকে দেখেছে ফ্রাঙ্ক। মুখ হাঁ হয়ে গেল তার বিস্ময়ে। পরক্ষণে নির্জলা আতঙ্ক গ্রাস করল ওকে! লম্বা পা ফেলে জাহাজগুলোর দিকে এগোচ্ছে ওটা। একটু পর আরেক জাতভাই'র আগমন ঘটল। তারপর আরেকটা। গাছপালা ভেঙে, তছনছ করে ওরা এগিয়ে এল। সবাই একযোগে পা বাড়াল জাহাজগুলোর দিকে।

ফ্রাঙ্কদের স্টিমার আকারে তেমন বড় নয়, আর বেশি জোরেও ছুটতে পারে না। জলে স্টিমারের প্যাড্‌ল্ ফেনা তুলে ঘুরছে ঠিকই কিন্তু গতি বড্ড মন্থর।

এদিকে নোঙর করা জাহাজগুলোর খবর হয়ে গেছে। হুইশ্‌ল্ বাজিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে সবগুলো বন্দর ছেড়ে যাবার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে উঠল। বিস্মিত ফ্রাঙ্ক এই দৃশ্য দেখতে ব্যস্ত, হঠাৎ তার স্টিমার আরেক জাহাজের সঙ্গে ধাক্কা থেকে বাঁচতে চট করে ঘুরে গেলে। ডেকের ওপর ছিটকে পড়ল ফ্রাঙ্ক।

আনন্দ আর উল্লাসের গগনবিদারী চিৎকারের বিস্ফোরণ ঘটল স্টিমারে। লাফিয়ে সিধে হলো ফ্রাঙ্ক, স্টার বোর্ডে তাকিয়ে দেখল লোহার বিশাল একটা আকৃতি সমুদ্র দু'ভাগ করে ছুটে আসছে, ফোয়ারার মত জল ছিটকে পড়ছে দু'পাশে। ভিজে একসা হয়ে গেল ফ্রাঙ্ক জলের ছিটায়। চোখ মুছে ভাল করে তাকাতেই বুঝল এটা সেই টর্পেডো যুদ্ধ জাহাজ 'থাণ্ডার চাইল্ড'। এগিয়ে আসছে জাহাজের অসহায় যাত্রীদের রক্ষা করতে।

রেইলিং ধরে ঝুঁকে পড়ল ফ্রাঙ্ক। মঙ্গলবাসীদের আক্রমণের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেছে যুদ্ধজাহাজগুলো। তিনটে ফাইটিং-মেশিন দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি, তিন ঠ্যাঙ অদৃশ্য জলের তলায়। বিশাল যুদ্ধ জাহাজের কাছে ওদেরকে মোটেও হুমকি বলে মনে হলো না ফ্রাঙ্কের। কিন্তু তার তখনও অনেক কিছু দেখার বাকি ছিল।

'থাণ্ডার চাইল্ড' গুলি-টুলি কিছু ছুঁড়ল না, শুধু পূর্ণগতিতে ফাইটিং মেশিনগুলোর দিকে ধেয়ে যেতে লাগল। মার্শিয়ানরা যেন তাদের এই নতুন শত্রুর উপস্থিতি টেরই পায়নি, জানে না কিভাবে মোকাবেলা

করতে হবে। নিতান্ত ভাল মানুষের মত তারা দাঁড়িয়েই থাকল।

প্রথম যে মঙ্গলবাসীকে দেখেছে ফ্রাঙ্ক, সে হঠাৎ তার কালোটিউব নামিয়ে একটা কানেস্তারা ছুঁড়ল 'থাণ্ডার চাইল্ডকে লক্ষ্য করে। জিনিসটা জাহাজের এক কোনায় লেগে ছিটকে গেল সমুদ্রে। পর মুহূর্তে গল গল করে ওটা থেকে কালো ধোঁয়া বেরুতে শুরু করল।

এবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মঙ্গলবাসীরা। পা বাড়াল তীরের দিকে। একজন তাপ-রশ্মি উঁচিয়ে ধরে তাক করল নদীর দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জলে যেন বাষ্পের বিস্ফোরণ হলো। থাণ্ডার চাইল্ড যেন পাতলা কাগজ, তাপ-রশ্মি ধারাল ছুরির মত সেঁধিয়ে গেল এক ধারে।

বাষ্পের আড়াল থেকে এইসময় ঝলসে উঠল অগ্নিশিখা, টলে উঠল একটা ফাইটিং মেশিন। পরক্ষণে বিস্ফোরিত হলো সে। 'থাণ্ডার চাইল্ড-এর গোলার আঘাতে টুকরো টুকরো হয়ে গেল চোখের পলকে।

মঙ্গলবাসীটাকে ধ্বংস হতে দেখে স্টিমারের যাত্রীরা আনন্দে গলা ফাটাতে শুরু করল। পরপর দুটো আঘাত সয়েও 'থাণ্ডার চাইল্ড' সচল রয়েছে। আরেক মঙ্গলবাসীর দিকে অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছুটল ওটা। ফাইটিং মেশিনের একশো গজের মধ্যে চলে এসেছে, 'থাণ্ডার চাইল্ড'কে, আবার আঘাত হানল তাপ-রশ্মি। 'বুম্' করে একটা শব্দ পরক্ষণে চোখ ঝলসানো আলো, যুদ্ধ জাহাজটির ডেক আর খোল নলচেগুলো বিস্ফোরণের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল খোলা সমুদ্রে। গোটা কাঠামোয় দাউ দাউ আগুন, তীব্র প্রতিহিংসা নিয়ে 'থাণ্ডার চাইল্ড' আছড়ে পড়ল দ্বিতীয় ফাইটিং মেশিনের গায়ে। দুমড়ে মুচড়ে মুহূর্তে ওটা পরিণত হলো ভাঙা একটা খেলনায়!

'দুই!' চিৎকার করে উঠল ক্যাপ্টেন।

'দুই!' প্রতিধ্বনি তুলল যাত্রীরা।

বাষ্পের মেঘ বেশ কিছুক্ষণ তৃতীয় ফাইটিং মেশিনটাকে আড়াল করে রেখেছিল। যখন পরিষ্কার হয়ে উঠল দৃষ্টি তখন না দেখা গেল 'থাণ্ডার চাইল্ড'কে, না পাত্তা পাওয়া গেল মার্শিয়ান ফাইটিং-মেশিনের। তবে সবাই বুঝে নিল তিন নম্বরটার দশাও তার সঙ্গীদের মত হয়েছে। মৃত্যুর আগে শেষ আঘাত হেনে গেছে 'থাণ্ডার চাইল্ড'।

প্রচণ্ড এই লড়াইয়ের পরে ফ্রাঙ্কদের স্টিমার আবার ছুটতে শুরু করল। এবার তাদের সঙ্গী হয়েছে আরও অনেক উদ্বাস্তু যাত্রী বোঝাই

নৌকা এবং জাহাজ।

সন্ধ্যার সময় ফ্রাঙ্ক রেলিং-এ ভর দিয়ে অস্তগামী সূর্য দেখছে, হঠাৎ তীরের দিকে মসৃণ এবং চওড়া অন্ধকার একটা পর্দার মত কি যেন চোখে পড়ল। একটু পরেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল ওর কাছে। তীরে দ্রুত অন্ধকার নামছে না—ওটা আসলে কালো ধোঁয়ার বিশাল এক মেঘ!

তেরো

আমার ভাই ফ্রাঙ্ক যখন লণ্ডনের বাইরে বিভীষিকাময় দিন কাটাচ্ছে আমি তখন পাদ্রীকে নিয়ে সানবারি গ্রামের এক পাহাড়ের ওপর লুকিয়ে আছি। সানবারির মানুষজন বিষাক্ত কালো ধোঁয়ার আক্রমণে মারা গেলেও আমরা বেঁচে গেছি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অনেক ওপরে আছি বলে, ধোঁয়া এত ওপরে উঠতে পারেনি। ভয়ানক আতঙ্কের মধ্যে দুটো দিন কেটে গেল। সভ্য দুনিয়ার সাথে আমাদের তখন কোনই যোগাযোগ নেই।

সোমবার দুপুরে, এক মঙ্গলবাসীকে দেখলাম মাঠে হাঁটছে। গরম বাষ্প ছুঁড়ে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ভেঙে দিল সে। বাড়িঘরের জানালার কাঁচ একটাও আস্ত রইল না বাষ্পের আঘাতে।

আরও অনেকক্ষণ পর লক্ষ করলাম অবিনাশী কালো ধোঁয়ার আর চিহ্ন নেই কোথাও। 'ধোঁয়া নেই।' চিৎকার করে জানান দিলাম আমি। 'আর ভয় নেই। এখন শিগগির বেরিয়ে পড়ি চলো।'

বেরুবার আগে ঘরে খাবার দাবার যা পেলাম সব নিয়ে নিলাম। ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল হাতে। তেল লাগালাম আহত জায়গাগুলোতে। পরিত্যক্ত বাড়িটাতে একটা আলমিরাও চোখে পড়ল। ফ্ল্যানেলের একটা শার্টও খুঁজে পেলাম। দ্রুত সব গোছগাছ করে বিকেল পাঁচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়লাম আমাদের সাময়িক আস্তানা ছেড়ে।

সানবারি'র রাস্তাঘাটে যত্রতত্র ছিটিয়ে আছে অসংখ্য গাড়ি-ঘোড়া আর বিকৃত চেহারার মানুষের অগুণতি লাশ। সবকিছুর ওপর কালো ধোঁয়ার একটা ঘন আস্তরণ লেপ্টে আছে।

হাঁটছি তো হাঁটছিই। প্রাণের চিহ্ন নেই কোথাও। হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম কিউ নামে আরেকটি গ্রামে। হঠাৎ দেখি ভয়ার্ত চেহারা নিয়ে গ্রামবাসীরা একটা মাঠের দিকে ছুটতে আরম্ভ করেছে। চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকাতেই আঁতকে উঠলাম আমি। গাছ-পালার মাথা ছাড়িয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এক বিশাল যন্ত্র-দানব।

মাত্র তিন কদম এগোল মার্শিয়ান ফাইটিং-মেশিন, পরক্ষণে ভয়াবহ দৃশ্যটা দেখলাম আমরা। দানবটা তার মারণাস্ত্র অর্থাৎ তাপ-রশ্মি ব্যবহার করল না, স্রেফ পিঁপড়ের মত পা দিয়ে পিষে ফেলল ছুটন্ত কয়েকজন মানুষকে। তারপর ইস্পাতের লম্বা শুঁড় এগিয়ে গেল কিলবিল করে, সাপের মত পেঁচিয়ে ধরল আরও কয়েকজনকে, টপাটপ ছুঁড়ে ফেলল পিঠে ঝোলানো বিরাট আকৃতির একটা ধাতব বাক্সের মধ্যে।

তার মানে জ্যান্ত মানুষ নিয়ে শয়তানগুলোর মাথায় এবার কোন দুরভিসন্ধি আছে, মনে মনে ভাবলাম আমি। ওটার চোখে আবার না পড়ি এই ভয়ে পাদ্রীকে নিয়ে একটা গর্তে নেমে পড়লাম আমি। এত ভয় পেয়েছিলাম যে অনেকক্ষণ বাকরুদ্ধ হয়ে থাকলাম। ভেবেছি ফিসফিস করলেও যদি ওটা আমাদের অবস্থানের কথা জেনে যায়!

আরও অনেক সময় পার করে দিলাম আমরা গর্তের মধ্যেই। তারপর সতর্ক ভঙ্গিতে বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে। যন্ত্র-দানবকে কাছে পিঠে কোথাও চোখে পড়ল না। তবুও রাস্তা দিয়ে হাঁটতে সাহস হলো না। ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে পথ করে মর্টলেকের কাছে এক জনমানব শূন্য বাড়িতে গিয়ে ঢুকলাম। বেশ কিছু খাবার চোখে পড়ল রান্নাঘরের একটা আলমিরাতে। রুটি, মাংস, হ্যাম, কয়েক বোতল বিয়ার, দুই ব্যাগ সীম, সুপের টিন, মাছ, বিস্কুট আর এক ডজন ওয়াইনের বোতল। এই খাবারে আগামী দু'হপ্তা দু'জনের মোটামুটি চলে যাবে।

আলো জ্বালাবার সাহস নেই। তাই রান্নাঘরে অন্ধকারে বসেই বিয়ার, হ্যাম আর রুটি খেয়ে নিলাম।

'তাড়াতাড়ি করো,' মিনতি করল পাদ্রী। 'আমাদের আবার বেরুতে হবে।'

'ভাল মত খেয়ে নাও। নইলে হাঁটার শক্তি পাবে না,' বললাম আমি।

মাত্র কথা শেষ করেছি হঠাৎ অন্ধকার ঘরটা ভরে উঠল চোখ ধাঁধানো সবুজ আলোয়। পরক্ষণে গগনবিদারী বিস্ফোরণের আওয়াজ,

ছিটকে পড়ল থালা-গ্লাস, কেঁপে উঠল দেয়াল, ছাদ থেকে প্লাস্টার ঝুরঝুর করে মাথায় পড়তে লাগল।

বিস্ফোরণের ধাক্কায় আমি মেঝেতে ছিটকে গিয়েছিলাম, মাথাটা ভীষণভাবে ঠুকে যায় চুলোর সাথে। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাই আমি। অনেকক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলাম। পরে পাদ্রী মাথায় জল ঢেলে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। কপালটা দপদপ করছে ব্যথায়, তবুও উঠে বসলাম।

'নড়ো না,' সাবধান করল পাদ্রী। 'মেঝেতে ভাঙা কাঁচ বোঝাই। নড়লেই শব্দ হবে। আর ওরা শুনতে পাবে। ওরা বাইরেই আছে বলে আমার ধারণা।'

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দু'জনেই বসে থাকলাম। বাইরে, খুব কাছে থেকে ভেসে এল ধাতব খনখন আওয়াজ।

'ওরাই!' মন্তব্য করল পাদ্রী।

বিপদ এত কাছে যে ভয়ের চোটে আমরা নড়াচড়া করারও সাহস পেলাম না। সারা রাত একভাবে বসে থাকলাম। ভোর হলো। সূর্যের আলো জানালা দিয়ে নয়, ঢুকল একটা ইঁট খসা গর্তের ফাঁক দিয়ে। এই প্রথম রান্নাঘরের অবস্থা খুঁটিয়ে দেখার সুযোগ হলো আমাদের।

এটাকে এখন আর কিছুতেই রান্নাঘর বলা যায় না। জানালা-টানালা কিচ্ছু নেই, ইঁটের একটা দেয়াল শুধু খাড়া হয়ে আছে আমাদের পেছনে। যেখানে কিছুক্ষণ আগে জানালা ছিল সেখানে যাদু বলে হাজির হয়েছে মাটির একটা টিলা, মেঝেতে ভাঙা বাসন-কোসন আর ইঁট পাথরের ছড়াছড়ি। মনে হয় সারা বাড়িটাই ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। শুধু কোনমতে সিধে হয়ে আছে রান্নাঘরের এই দেয়াল। কিন্তু দেয়ালের বাইরে ওরা ক'জন আছে?

বেলা আরও বাড়ল। বেশ আলোকিত হয়ে উঠল ভাঙা রান্নাঘর। দেয়ালের ত্রিভুজাকৃতির ফুটোতে উঁকি দিলাম আমরা। এক মঙ্গলবাসীকে চোখে পড়ল। পাহারা দিচ্ছে একটা চকচকে সিলিণ্ডার।

'ওটা পাঁচ নম্বর সিলিণ্ডার!' ফিসফিস করে বললাম আমি, 'মঙ্গল থেকে ওটাকে অন্যগুলোর মত ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। মাটিতে ল্যাণ্ড করার সময় ওটাই ঘরটার এই দশা করেছে!'

'ঈশ্বর! আমাদের রক্ষা করো!' ফিসফিস করে বলল পাদ্রী। তারপর

ফোঁপাতে শুরু করল।

রান্নাঘর থেকে প্রায় নিঃশব্দে বেরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকলাম দু'জনে। ঘরটা অন্ধকার। বাসন-কোসন, শাক-সব্জি ইত্যাদি ধোয়া-পাকলা হত এই ঘরে। এখানে এসে চুপচাপ বসে পড়লাম মাটিতে। জোরে শ্বাস করতেও ভয় লাগছে। যদি ওরা শুনে ফেলে!

অনেক সময় কেটে গেল। কেউ একটা কথাও বললাম না। সম্ভবত গোটা একটা দিন এভাবে বসে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। ক্লান্তিতে কখন চোখ বুজে এসেছিল জানি না। ধাতব ঠংঠং আওয়াজে হঠাৎ জেগে গেলাম। পাশে তাকাতে দেখি পাদ্রী নেই।

'পাদ্রী ভাই? পাদ্রী ভাই,' গলার স্বর খাদে নামিয়ে ডাকলাম আমি। কিন্তু লোকটা কোনও সাড়াশব্দ নেই। রান্নাঘরে যায়নি তো?

ঠিক তাই। রান্নাঘরের দেয়ালে ত্রিভুজ ফুটোর কাছে মাথা দিয়ে শুয়ে আছে পাদ্রী। বাইরে এখনও আলো। মেঝেতে ছড়ানো ভাঙা কাপ-গ্লাস থেকে গা বাঁচিয়ে ফুটো দিয়ে উঁকি দিলাম বাইরে। ধক করে উঠল বুক।

বাড়ির সামনে যে রাস্তাটা ছিল ওটা এখন 'নেই' হয়ে গেছে। ওকিং-এর খাদের চেয়ে বিরাট এক গর্ত সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। সিলিণ্ডারটা পড়ে আছে গর্তের মধ্যে, মাটির বিশাল এক টিলা ওটার মাথার ওপর।

বাড়ির সামনের অংশ সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেলেও স্রেফ ভাগ্যের জোরে রান্নাঘর আর বাসন-মাজার ঘরটা রক্ষা পেয়েছে। সিলিণ্ডারের দিকে মুখ করা অংশ ছাড়া চারপাশ দিয়ে টন টন মাটি ঘরদুটোকে চাপা দিয়ে রেখেছে।

গর্তের দূর প্রান্তে, ছিন্নভিন্ন হওয়া ঝোঁপঝাড়ের কাছে, পাহাড়ের মত অটল দাঁড়িয়ে আছে এক ফাইটিং মেশিন। আর গর্তের মধ্যে অদ্ভুত কতগুলো প্রাণী ঘুর ঘুর করছে। বেশ শ্রান্ত মনে হলো ওগুলোকে। মহাশূন্যের লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে এসে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

কাছেই একটা ঝকঝকে, জটিল চেহারার যন্ত্রকে দেখলাম কাজে ব্যস্ত। পাঁচটা পা ওটার, যেন ধাতব কাঁকড়া। সারা শরীরে অসংখ্য লিভার আর বার, সেইসঙ্গে অসংখ্য লম্বা, বাঁকানো শুঁড় যন্ত্রটাকে আরও বিকট দর্শন করে তুলেছে। তিনটে শুঁড় সিলিণ্ডার থেকে প্রচুর মেটাল রড, প্লেট, বার ইত্যাদি বের করে মাটিতে রাখছে।

কাঁকড়াটার মাথার মাঝখানে বসে আছে ভয়াল দর্শন এক মঙ্গলবাসী। ওটাই যন্ত্রটাকে চালাচ্ছে। আর অন্যান্য মার্শিয়ানরা গর্তের চারপাশে কাজ করে চলেছে। এই প্রথম আমি খুব কাছে থেকে মঙ্গলবাসীদের পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেলাম। এই মুহূর্তে অন্তত হঠাৎ ধরা পড়ার ভয় নেই। তাই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম ওগুলোকে।

মঙ্গলবাসীদের মত এমন ভয়ঙ্কর, বিকট দর্শন এবং সৃষ্টি ছাড়া জীব জীবনে দেখিনি আমি। কল্পনাতেও এমন বীভৎস চেহারার ছবি আসে না। বিশাল গোলাকার শরীর, চারফুট ব্যাসার্ধের মাথাটা গোল। মাথার সামনে একটা মুখ। মুখে কাকের মত কালো দুটো চোখ, ঠিক নিচে পাখির মত বাঁকানো মাংসল ঠোঁট। মুখের কোথাও নাসারন্ধ্র নেই—আসলে মঙ্গলবাসীদের গন্ধ শোঁকার ক্ষমতাও নেই। মাথার পেছনে কিংবা বলা যায় শরীরের পেছনে (মাথাটাই আসলে ওদের শরীর) একটা গোল, ছোট ড্রামের মত, পাতলা চামড়ায় মোড়া। পরে জেনেছি ওই ড্রামটাই ওদের কান। তবে পৃথিবীর ঘন বায়ুমণ্ডলে এই কান ওদের কোন কাজে আসে না।

মঙ্গলবাসীদের মুখ ঢেকে আছে চাবুকের মত পাতলা দুই পাশে আটটা করে মোট ষোলোটা শুঁড় দিয়ে। এগুলো ওদের হাত।

বিজ্ঞানীরা পরে আবিষ্কার করেছেন মঙ্গলবাসীদের শরীরের সবচে' বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ওদের মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্ক থেকেই অসংখ্য স্নায়ুতন্ত্র চলে গেছে চোখ, কান এবং শুঁড়গুলোতে। মুখের সঙ্গেই ওদের বিশাল এবং ভারী ফুসফুস, শ্বাস নেয়ার সময় খিঁচুনি ওঠে গায়ের চামড়ায়। মস্তিষ্ক আর ফুসফুস ছাড়া মঙ্গলবাসীদের আর কোন অভ্যন্তরীণ অঙ্গ নেই।

মঙ্গলবাসীদের সাথে আমাদের শারীরিক পার্থক্য চারটি দিকে। প্রথমত, ওরা কখনও ঘুমায় না, সারাক্ষণ কাজ নিয়েই ব্যস্ত। যেমন আমাদের হৃৎপিণ্ড অবিশ্রাম কাজ করে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, মঙ্গলবাসীদের মধ্যে কোনও নারী পুরুষ নেই। পৃথিবীর কিছু উদ্ভিদ যেমন অন্য কিছুর দ্বারা নিষিক্ত না হয়েই জন্মায়, মঙ্গলবাসীরাও তেমন। তৃতীয়ত, মঙ্গলবাসীদের আকার-আকৃতি সম্ভবত অনেকটাই মানুষের মত ছিল। কিন্তু ব্যবহারের অভাবে শুধু মস্তিষ্ক আর হাত (ষোলোটি শুঁড়) ছাড়া শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। আর সবশেষ

ব্যাপারটি হলো, যে সব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুর কারণে আমরা জ্বরজারী, ক্যান্সার সহ আরও ভয়ঙ্কর সব রোগের কবলে পড়ি মঙ্গলবাসীরা সে সব থেকে মুক্ত। হয় এসব জীবাণুর অস্তিত্ব মঙ্গলে কোনকালে ছিল না অথবা মঙ্গলবাসীরা তাদের উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে অনেক আগেই এসব ঝামেলা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করে রেখেছে।

চোদ্দ

বন্দী জীবনের অসহায় অবস্থার কারণেই বোধহয় পাদ্রীর কথাবার্তা, আচার আচরণ উদ্ভট এবং অসংলগ্ন হয়ে উঠল। ওর যন্ত্রণায় পাগল হবার যোগাড় হলাম। যখন আমি একা বসে এখান থেকে পালাবার ফন্দী বের করার চেষ্টা করছি, পাদ্রী তখন চোখের জলে ভাসছে। খাবারের মজুত আমাদের খুব বেশি নয়। পাদ্রীকে বহুবার বলেছি হিসেব করে খেতে। কারণ মঙ্গলবাসীরা যতদিন বাইরে অবস্থান করবে ততদিন আমরা এই জায়গা থেকে বেরুতে পারব না। কিন্তু আমার কথা যেন কানেই যায় না ব্যাটার। লুকিয়ে যখনই সুযোগ পায় হামলে পড়ে খাবারের ওপর।

একদিন পাদ্রী ফুটোয় চোখ রেখে বসে আছে, আমি ওর পেছনে। হঠাৎ যেন ঘুষি খেয়ে পেছন দিকে সরে এল সে, খপ করে আমার হাত চেপে ধরল। ভয়ে কাঁপছে থরথর করে। কৌতূহল হলো খুব। ফুটো দিয়ে তাকালাম বাইরে।

গর্তে সবুজ আলোর ঝলক, সিলিণ্ডারের কাছে কাজে ব্যস্ত একটা যন্ত্র থেকে বিচ্ছুরণটা হচ্ছে। নীল-সবুজ রঙের পাউডারের একটা ঢিবির সামনে দাঁড়ানো অনেকগুলো মঙ্গলবাসী। আর পা খাটো এবং ভাঁজ করে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছে একটা ফাইটিং-মেশিন। ওটার হুডের মধ্যে, অনুমান করলাম আমি, নিশ্চই কোন মার্শিয়ান লুকিয়ে আছে। সবুজ শিখাটা আরও উজ্জ্বল হতে ওটার চকচকে চামড়া আর উজ্জ্বল চোখও নজরে এল।

হঠাৎ তীব্র চিৎকার শুনতে পেলাম—আর্তনাদ করছে কোন মানব সন্তান। মেশিনটার লম্বা একটা শুঁড় ঝাঁকি খেল, সাঁৎ করে উঠে গেল

কাঁধের ওপর, বাঁকা হলো পিঠে বাঁধা একটা ছোট ঝুড়ির দিকে। তারপর কি একটা—কি যেন একটা ভয়ানক হুটোপুটি শুরু করল ঝুড়ির মধ্যে—একটু পরেই শুঁড়টা খাড়া হলো আকাশের দিকে মুখ করে। শিউরে উঠলাম আমি। শুঁড়টা পেঁচিয়ে ধরে রেখেছে জলজ্যান্ত একজন মানুষকে--বলিষ্ঠ, দামী পোশাক পরা, মধ্য বয়স্ক একটি লোক। শুঁড়টা তার অসহায় শিকারকে খামচে ধরে ইচ্ছে মত শূন্যে ঝাঁকাতে শুরু করল।

হঠাৎ মাটির দিকে নেমে এল হিলহিলে সাপটা, আলগা করল বাঁধন, লোকটাকে ছুঁড়ে দিল মঙ্গলবাসীদের মাঝখানে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা তাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল। এক মুহূর্তের জন্য আশ্চর্য নীরব হয়ে গেল প্রকৃতি। তারপরই কলজে কাঁপানো চিৎকার! মঙ্গলবাসীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল কি একটা কারণে। অবশ্য একটু পরেই কারণটা বুঝতে পেরে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল আমার। ওরা মানুষটার রক্ত শুষে নিচ্ছে! ছোট একটা পাইপ দিয়ে শুষে নেয়া রক্ত নিজেদের শরীরে ঢুকাচ্ছে শয়তানগুলো।

ধপাস করে পড়ে গেলাম আমি যেখানে উঁকি দিয়ে দেখছিলাম সেখান থেকে। দু'হাতে কান চেপে ধরে দৌড় দিলাম বাসন-মাজা ঘরের দিকে। সে রাতে আর কারও ঘুম হলো না। চোখ বুজলেই দেখতে পাই মঙ্গলবাসীদের রক্ত-পানের দৃশ্য। পালাবার কত প্ল্যান খুঁজলাম, কিন্তু পেলাম না।

পরদিন থেকে বোবা হয়ে গেল পাদ্রী। ধকল সামলাতে পারেনি। পশুর মত আচরণ করতে লাগল সে। কিন্তু আমি নিজেকে স্থির রাখলাম। কিছুতেই ধৈর্যহারা হলে চলবে না।

পনেরো

বন্দী অবস্থায় কেটে গেল আরও ছ'টা দিন। কিন্তু অবস্থার কোন পরিবর্তন নেই। প্রতিদিনই পালা করে ফুটোয় চোখ রেখে দু'জনে মঙ্গলবাসীদের কাণ্ডকারখানা দেখি। যখন পাদ্রী ফুটোতে চোখ লাগায় আমি তখন পাশে বসে থাকি। আর আমার পালা এলে সে বসে

থাকে পাশে। সেদিন যথারীতি ফুটোতে চোখ লাগিয়েছি, হঠাৎ তাকিয়ে দেখি পাদ্রী নেই। সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক হয়ে উঠলাম। দ্রুত ছুটলাম বাসন মাজার ঘরে। যা অনুমান করেছিলাম তাই। অন্ধকারে বসে পাদ্রী ঢকঢক করে মদ গিলছে।

খপ করে বোতলটা চেপে ধরলাম আমি। ছিনিয়ে নিতে চাইছি, বাধা দিল পাদ্রী। টানাটানিতে ওটা হাত ফস্কে পড়ে গেল মাটিতে, ঝনঝন শব্দে ভাঙল। হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে দাঁড়ালাম দু'জনেই। রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললাম, 'এই এখন থেকে আমি সব খাবার ভাগ করে ভাঁড়ার ঘরে রাখব। রুটিন করে খেতে হবে। আর আজ তোমার খাওয়া বন্ধ।'

কিন্তু পাদ্রী আমাকে শুধু জ্বালাতন করেই গেল। এখানে সে আর থাকতে পারছে না, আর একদণ্ড এখানে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে ইত্যাদি নালিশে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। আমি ওকে প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করলাম চাইলেই এখান থেকে বের হওয়া যাবে না। কিন্তু কোন কথা শুনতে চাইল না সে। তার একঘেয়ে প্যানপ্যানানিতে মাথা ধরে গেল আমার। মনে হলো পাগল হয়ে যাব। পাদ্রীকে ইচ্ছেমত বকলাম; একদিন ধরে মারও দিলাম। কিন্তু তারপরও যদি তার মৃগী রোগ থামে! আর সুযোগ পেলেই খাবার চুরি করে সে। সেই সঙ্গে একা কথা বলার অভ্যাস তো আছেই। শেষদিকে ওকে নিয়ে রীতিমত ভয় হতে লাগল আমার। কারণ বুঝতে পারছিলাম পাদ্রীর মাথার স্ক্রু নড়বড়ে হয়ে গেছে।

অষ্টম দিনের দিন পাদ্রীর পাগলামি আরও বেড়ে গেল। আস্তে কথা বলার নির্দেশ ভুলে সে গলা ফাটাতে শুরু করল। 'পাপ করেছি আমরা!' চিৎকার করে বলল সে। 'পাপী আমরা! আমাদের নিশ্চই সাজা হবে! আমি মঙ্গলবাসীদের নিয়ে আসব আমাদের সাজা দিতে।'

'শান্ত হও!' মিনতি করলাম আমি। ভয়ে ভেতরে কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে গেছে আমার তখন। 'ঈশ্বরের দোহাই···।'

'না,' ফুসফুসের সমস্ত শক্তি জড় করে চিৎকার দিল পাদ্রী। হাত দুটো মাথার ওপর ছুঁড়ে বলল, 'শাস্তি পাওনা হয়েছে আমাদের। আর এ শাস্তি এখুনি ভোগ করতে চাই আমি। নইলে দেরি হয়ে যাবে অনেক। আমি বাইরে যাব। কপালে যা আছে তাই মেনে নেব।'

ঘুরে দৌড় দিল সে রান্নাঘরের দরজা লক্ষ্য করে। আমি দেয়ালে

ঝোলানো মাংস কাটার ছুরিটা নিয়ে তার পেছনে ধাওয়া করলাম। রান্নাঘরের দরজা মাত্র খুলেছে পাদ্রী, এই সময় ওর পেছনে গিয়ে হাজির হলাম আমি। কিন্তু কোপ মারতে মায়া হলো, ছুরির হাতল দিয়ে সজোরে আঘাত করলাম পাগলটার মাথায়। কাটা কলাগাছের মত মাটিতে পড়ে গেল সে জ্ঞান হারিয়ে।

দরজায় হেলান দিয়ে আমি হাঁপাতে শুরু করলাম। হঠাৎ একটা শব্দ এল কানে। তারপরই রান্নাঘরের দেয়ালের ফুটো দিয়ে কাঁকড়া দানবের এক লম্বা শুঁড় ঢুকে পড়ল ভেতরে। পর মুহূর্তে ফুটোর সামনে আত্মপ্রকাশ করল ভয়ঙ্কর একটা মুখ। বড়, কালো চোখ দুটোর দিকে চেয়ে আত্মা উড়ে গেল আমার। ওটার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে পেছনে সরতে গেছি, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম পাদ্রীর গায়ে ধাক্কা লেগে।

ঘরের মধ্যে শুঁড়টা এখন অনেকটাই ঢুকে পড়েছে। কয়েকবার কুঁচকে গেল ওটা, মোচড় খেল, ঘুরল। কি যেন খুঁজছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত ওটার দিকে তাকিয়ে থাকলাম আমি। তারপর হঠাৎই যেন ফিরে পেলাম সংবিৎ। কয়েক হাত দূরে কয়লা সেলারে ছুটলাম কাঁপতে কাঁপতে। সাঁৎ করে দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। কিন্তু চিন্তা হলো খুব। আমাকে কি ওটা দেখতে পেয়েছে? এখন ওটা কি করছে?

কয়লা সেলারের কয়লার চেয়েও কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুনলাম রান্নাঘরে মঙ্গলবাসীর লম্বা শুঁড় এখনও সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেয়ালে ওটা ধাক্কা দিল, ধাতব শরীরে হালকা শব্দ হলো। তারপর কানে ভেসে এল একটা ভারী দেহ—জানি কি ওটা—রান্নাঘরের মেঝের ওপর দিয়ে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কৌতূহল দমাতে পারলাম না। সেলারের দরজা সামান্য ফাঁক করলাম। উঁকি দিলাম রান্নাঘরে। ফুটো দিয়ে ভেসে আসা সূর্যের আলোয় ঘরের অনেকটাই আলোকিত। দেখলাম মঙ্গলবাসীর কাঁকড়া-দানব পাদ্রীর ছিন্ন মুণ্ডুটা গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে। ভয় হলো পাদ্রীর মাথার ফুলে থাকা আঘাতের কারণ যদি ওটা বুঝে ফেলে তাহলে আমার আর রক্ষা নেই। তাই সাবধানে দরজা বন্ধ করে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে এলাম কয়লা সেলারে। চুপচাপ বসে থাকলাম কয়লা আর জ্বালানী কাঠের স্তূপের মধ্যে।

হঠাৎ ধাতব ঝনঝন শব্দটা আবার শুরু হলো। রান্নাঘর থেকে

আসছে। একটু পর সেলারের দরজায় নখ আঁচড়ানোর শব্দ হলো। শিড়দাঁড়া বেয়ে নেমে গেল ভয়ের ঠাণ্ডা স্রোত। নিশ্বাস বন্ধ করে রাখলাম। মনে হলো এর বুঝি শেষ নেই। এই সময় দরজার খিল হাতড়ানোর শব্দ। সেলারের দরজার সন্ধান পেয়ে গেছে ওটা!

কয়েক মুহূর্ত পরে খুলে গেল খিল, হাঁ হয়ে গেল দরজার দু'পাট। অন্ধকারের মধ্যে হাতির শুঁড়ের মত একটা জিনিস এগিয়ে আসতে দেখলাম আমার দিকে। ছাদ, কয়লা, কাঠ সব ছুঁয়ে দেখল ওটা, পরীক্ষা করল।

তারপর আমার জুতোর হিল পেয়ে গেল শুঁড়টা। মুখ হাঁ হয়ে গেল আমার, চিৎকার বন্ধ করতে হাত কামড়ে ধরলাম। এক সেকেণ্ডের জন্য স্থির থাকল ওটা, তারপর 'ক্লিক' করে একটা শব্দ। কি যেন আঁকড়ে ধরেছে শুঁড়টা। মানস চক্ষে স্পষ্ট দেখলাম ঠাণ্ডা, ধাতব একটা স্পর্শ আমার সারা শরীর জুড়ে···

কিন্তু কিছুই ঘটল না। সম্ভবত এক টুকরো কয়লা নিয়ে সেলারের বাইরে চলে গেল হিলহিলে জিনিসটা।

তারপরও নড়লাম না আমি। চোখ বেয়ে জল পড়ছে, ফিসফিস করে ঈশ্বরের কাছে একমনে প্রার্থনা করে চললাম। আবার শব্দ হলো! সেই ধাতব শব্দ! ওটা আবার এগিয়ে আসছে আমার দিকে। প্রতিটি দেয়ালে আঁচড় কাটল ভয়ঙ্কর শুঁড়, আসবাবগুলোতে ঠকঠক আওয়াজ তুলে এগোল সেলারের দরজার দিকে। কিন্তু কি মনে করে ওটা দিক পরিবর্তন করল। চলে গেল ভাঁড়ার ঘরে। বিস্কুটের টিন আর বোতল ভাঙার শব্দে পিলে চমকে উঠল আমার। কিছুক্ষণ পরে আবার নীরবতা। ওটা কি এবার সত্যি চলে গেছে?

ঝুঁকি নিলাম না। সারাদিন একঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম কয়লা আর জ্বালানী কাঠের স্তূপের মধ্যে। অন্ধকারে যেন কবর হয়েছে আমার। প্রচণ্ড পিপাসায় ফেটে যেতে চাইল বুক। তারপরও সেলারের বাইরে এক পা বাড়াতে সাহস হলো না।

ষোলো

আরও ক'টা দিন কেটে গেল আতঙ্ক, ভয় আর অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে। সেলারের অন্ধকারে মানবেতর জীবন যাপন করছি আমি। ভাঁড়ার ঘরে এক দানা খাবার নেই। মঙ্গলবাসীরা সব হাতিয়ে নিয়ে গেছে। এই ব্যাপারটা আবিষ্কার করে তীব্র হতাশায় ভেঙে পড়লাম আমি। বুঝতে পারলাম মৃত্যু আমার অবধারিত।

পরপর দুটো দিন অনাহারে কাটাতে হলো। না আছে পানি না খাবার। মুখ আর গলা শুকিয়ে খড়খড়ে হয়ে গেল, দ্রুত শক্তি হারাতে শুরু করলাম। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হলো খাওয়ার চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবছি না আমি।

এভাবে কেটে গেল বারোটা দিন। গলা ফুলে ঢোল। আর সহ্য করতে পারলাম না। বেপরোয়া হয়ে উঠলাম। যা থাকে কপালে রান্নাঘরে গিয়ে কল খুলে অন্তত জলটুকু আমাকে খেতেই হবে। টিউবওয়েল পাম্প করে জল খেলাম। পাম্পের শব্দে সাপের মত কোন শুঁড় হিলহিলিয়ে এগিয়ে এল না দেখে অবাকই হলাম। স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেললাম বুক ভরে।

পরের দুটো দিন কেটে গেল স্রেফ ঝিমুনিতে। ঘুম এলেও ভয়ঙ্কর সব দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে উঠে জেগে গেলাম।

পনেরো দিনের মাথায় রান্নাঘরে একটা শব্দ শুনলাম। মনে হলো কুকুর। কিছু একটাতে আঁচড় কাটছে। বুকে হেঁটে বেরিয়ে এলাম সেলার থেকে। কুকুরই বটে। দেয়ালের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিয়েছে নাক। আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে উঠল।

'আস্তে ব্যাটা আস্তে,' ফিসফিস করে বললাম আমি। ভয় হলো ওর ডাক শুনতে পারে মঙ্গলবাসীরা।

কিন্তু কুকুরটা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেশ অনেকক্ষণ কোন সাড়াশব্দ এল না কোথাও থেকে। সাহস করে এবার ফুটো দিয়ে উঁকি দিলাম বাইরে।

মঙ্গলবাসীদের তৈরি করা গর্তের এক ধারে কতগুলো কাক একটা

কঙ্কাল নিয়ে ঠোকাঠুকি করছে। হিংস্র মার্শিয়ানদের অসহায় কোন শিকার। খেয়ে ফেলে রেখেছিল। বাকিটুকুর সদ্ব্যবহার করছে কাকগুলো। তবে গর্তের আর কোথাও কোন জীবিত প্রাণী চোখে পড়ল না। নিজের চোখকে বিশ্বাস হলো না। মঙ্গলবাসীদের একটা যন্ত্রও নেই। খাঁ খাঁ করছে শূন্য গর্ত।

শরীরটাকে টেনে বের করলাম ধ্বংসস্তূপ থেকে, দাঁড়ালাম পাথরকুচির একটা ঢিবির ওপর। মঙ্গলবাসীদের চিহ্ন নেই কোথাও। তাহলে কি এবারের মত বেঁচে গেলাম!

কাহিল শরীর নিয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমার এতদিনের আশ্রয়দাতা ভাঙা বাড়ির ছাদে গিয়ে উঠলাম। উত্তর, দক্ষিণ, পুব, পশ্চিম সব দিকে তীক্ষ্ণ নজর বোলালাম। নাহ্, মঙ্গলবাসীদের কাউকে নজরে এল না।

কিছুদিন আগেও যে মর্টলেক গ্রামের সুন্দর সাদা বাড়ি আর ঘন বৃক্ষ সারি মানুষকে মুগ্ধ করত এখন সেই গ্রাম বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র ধ্বংস আর মৃত্যুর ছড়াছড়ি। পোড়া গাছগুলো ন্যাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঘরবাড়ির অবস্থাও তাই।

এই ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়েও বুক ভরে শ্বাস নিলাম আমি। এখন আমি স্বাধীন এবং মুক্ত! হঠাৎ টান পড়ল পেটে। নাড়িভুঁড়িগুলো নির্মম ভাবে মনে করিয়ে দিল অনেকদিন পেটে দানা-পানি কিছু পড়েনি। একটা নিচু দেয়ালের পাশে একটা বাগান নজরে এল আমার। দ্রুত হাঁটা দিলাম সেদিকে।

কিছু পেঁয়াজ এবং গাজর ছাড়া অন্য কিছু পেলাম না বাগানে। ওগুলোই গবগব করে খেয়ে ফেললাম। তারপর দেয়াল ডিঙিয়ে রওনা হলাম কাছের গ্রামের উদ্দেশে।

ভাগ্য ভালই আমার। পথ চলতে কিছু ব্যাঙের ছাতাও পেয়ে গেলাম। ওগুলোও পেটে চালান দিতে দেরি করলাম না। একটা সরু নদী থেকে আঁজলা ভরে পান করলাম জল। তারপর বিশ্রাম নিতে বসলাম ঘন এক ঝোপের আড়ালে। দুর্বল শরীর আর চলতে চাইছে না।

সূর্য পাটে যাবার পর উঠে দাঁড়ালাম আমি। যাত্রা শুরু করলাম পাটনি গ্রামের দিকে। একটা পাহাড়ে উঠে দেখি এই গ্রামটাও মঙ্গলবাসীদের তাপ-রশ্মির রোষ থেকে রক্ষা পায়নি। চারদিকে মৃত্যুর নিস্তব্ধতা। মনে হলো গোটা বিশ্ব চরাচরে একা আমি শুধু বেঁচে আছি। মঙ্গলবাসীরা

হয়তো এখানের পাট চুকিয়ে বার্লিন কিংবা প্যারিসে গিয়ে নতুন উদ্যমে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছে।

পাহাড় চুড়োয় একটা পরিত্যক্ত সরাইখানা হঠাৎ নজর কাড়ল আমার। দ্রুত এগিয়ে গেলাম সেদিকে। খাবারের খোঁজে চষে ফেললাম সব ক'টা ঘর। যা পেলাম মন্দ নয়। ইঁদুরে খাওয়া বেশ কিছু রুটি, দুই ক্যান আনারসের রস, আর অনেকগুলো শক্ত হয়ে যাওয়া বিস্কুট।

খাবারগুলো কিছু নষ্ট হলেও গোগ্রাসে গিলতে কসুর করলাম না। ভরপেট খেয়ে দু'চোখে নেমে এল ঘুম। এখানে ঘুমাতেও অসুবিধে নেই। কারণ বেশ আরামদায়ক বিছানাও আছে একটা ঘরে। তবে ঘুমাতে যাবার আগে প্রতিটা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম। কি জানি দানবগুলো কোথায় ঘাপটি মেরে আছে। কিন্তু কোথাও ওদের টিকিটিও নেই। নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু ঘুম এল না। আমার স্ত্রীর কথা খুব মনে পড়তে লাগল। ওর কোন খবর আমি জানি না। অসংখ্য অশুভ চিন্তা অস্থির করে তুলল আমাকে। লাফিয়ে উঠে বসলাম। উদভ্রান্তের মত পায়চারি শুরু করলাম এঘর-ওঘর। প্রার্থনা করলাম ও যদি মারাও যায় তাহলে সে মৃত্যু যেন হয় তাপ-রশ্মির আঘাতে, শয়তান মঙ্গলবাসীদের হাতে যেন ধরা না পড়ে।

পরদিন ভোর বেলায় আবার বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। লেদারহেডে যাব ঠিক করেছি। যদিও জানি আমার স্ত্রীকে ওখানে দেখা পাবার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। ওর যদি কোন দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে নিশ্চই মামাত ভাইদের নিয়ে কোথাও পালিয়ে গেছে। তাহলে হয়তো ওকে খুঁজে পাব। ওকে একটু দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলাম আমি। বুক টনটন করতে লাগল ব্যথায়।

একটা জলার ধারে আসতে আমার কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হলো কে যেন আমার ওপর নজর রাখছে। চট করে ঘুরে দাঁড়ালাম। সামনে, ঝোপের মধ্যে কি যেন একটা লুকিয়ে আছে।

সতর্ক পায়ে এগোলাম ওটার দিকে। হঠাৎ নড়ে উঠল ঝোপ, উঁচু হতে শুরু করেছে…ঝট করে বেরিয়ে এল এক লোক। হাতে ধারাল খঞ্জর, চোখ কটমট করে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে।

আমার মতই লোকটার পরনে ছেঁড়া, নোংরা জামা, কালো চুলে ঢেকে আছে চোখ, মুখটা ধুলোবালিতে ভূতের মত লাগছে, চিবুকে লম্বা,

লালচে একটা কাটা দাগ।

আমি ওর দিকে এক পা বাড়াতেই কর্কশ গলায় হুমকি দিল সে। 'দাঁড়াও। কোত্থেকে আসছ তুমি?'

'মেবারি হিল থেকে,' বললাম আমি। 'মঙ্গলবাসীদের হাতে এতদিন বন্দী ছিলাম। পালিয়ে এসেছি।'

'ঠিক আছে, কিন্তু এখানে তোমার থাকা চলবে না। এই এলাকা আমার।'

'এখানে থাকার কোন খায়েশ আমার নেই,' জানালাম ওকে। 'আমি অনেকদিন হলো সভ্য সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। জানি না এতদিনে কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে। তাই আমি লেদারহেডে যাচ্ছি আমার স্ত্রীর খোঁজ নিতে।'

সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে লোকটা জরিপ করল। তারপর লাফিয়ে উঠল। 'আরে আপনি! আপনিই তো আমার বিপদের সময় আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, খেতে দিয়েছিলেন। আমি ভেবেছি আপনি ওয়েব্রিজে অনেক আগেই খতম হয়ে গেছেন।' আমিও সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেললাম লোকটাকে। 'আরে, তুমিই সেই সৈনিক না যে আমার বাসায় গিয়েছিলে!'

'জ্বী! জ্বী!' আমার হাতে ঝাঁকি দিতে দিতে বলল সে। 'মঙ্গলবাসীরা নদী ছেড়ে চলে গেলে আমি মাঠের মধ্যে থেকে পালিয়ে আসি। তাও আজ ষোলোদিন হলো। আর···গুড লর্ড, ম্যান, আপনার চুল দেখি সব পেকে গেছে!···আচ্ছা, কথা পরে হবে। ওই ঝোপটার আড়ালে যাই, চলুন।'

'কোন মঙ্গলবাসীকে দেখেছ?' ঝোপের আড়ালে নিজেদের আড়াল করে জানতে চাইলাম আমি।

'ওরা লণ্ডনের দিকে গেছে,' বলল সে। 'এক রাতে হঠাৎ আলোকিত হয়ে ওঠে আকাশ। আমার ধারণা ওরা ফ্লাইং-মেশিন তৈরি করেছে। কারণ গত রাতে এরকম একটা জিনিস আমি আকাশে উড়তে দেখেছি।'

'ফ্লাইং-মেশিন!' আর্তনাদ করে উঠলাম আমি। 'তাহলে আমাদের আর রক্ষা নেই। ওরা যদি উড়তে পারে তাহলে পৃথিবীর যে কোন জায়গায় স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারবে। তারমানে গোটা পৃথিবী ওদের পদানত হতে চলেছে।'

মাথা দোলাল সৈনিক। 'আমরা এমনিতেও শেষ হয়ে গেছি। ওরা আমাদের মেরে ধরে শেষ করে দিচ্ছে। অথচ ওদের মাত্র কয়েকটাকে আমরা ধ্বংস করতে পেরেছি। আমাদের আর আশা নেই।'

মঙ্গলবাসীদেরও ধ্বংস করা যাবে, ক্ষীণ হলেও এই আশায় মাত্র বুক বাঁধতে শুরু করেছি, সৈনিকের কথায় সেটুকুও ফুৎ করে নিভে গেল।

'নদীতে যে ক'টা মার্শিয়ান মারা পড়েছে,' বলে চলল সে, 'তা ছিল নিতান্তই দুর্ঘটনা। আর ওই আক্রমণ তো মাত্র ওদের শুরু ছিল। ওরা আরও আসবে। আমি আরও সবুজ তারা পড়তে দেখেছি। হয়তো প্রতিদিনই একটা দুটো করে পড়ছে।'

হঠাৎ ওগিলভির কথা মনে পড়ে গেল আমার। বুড়োর ব্যাপারটা তাকে ব্যাখ্যা করে বললাম, 'কিন্তু টেলিস্কোপে তো মাত্র দশটা মিসাইল পতন আমরা দেখেছি। এরপর আর দেখিনি।'

'হয়তো ওদের মারণাস্ত্রে কোন গোলমাল দেখা দিয়েছিল।' বলল সৈনিক। 'কিন্তু সমস্যার ঠিকই সমাধান করে ফেলবে ওরা। ওদের হাত থেকে আমাদের রক্ষা নেই। আমরা ওদের কাছে পিঁপড়ের চেয়েও তুচ্ছ। আমাদের শহর, নগর, বন্দর সব ধ্বংস করে তারপর ইচ্ছেমত আমাদের বন্দী করে ঢুকিয়ে রাখবে খাঁচায়। আমাদের দেশ, আমাদের জাতি, আমাদের সভ্যতা, আমাদের সমৃদ্ধি—সব শেষ। শেষ হয়ে গেছি আমরা।'

'কিন্তু বাঁচার কি কোনও উপায়ই নেই?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমি অন্তত অসহায় ভাবে মরতে চাই না।' বলল সে। 'কুৎসিত মার্শিয়ানগুলোর হাতে বন্দী হবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। নিজেদের কিভাবে রক্ষা করব তা নিয়ে অনেক ভেবেছি আমি। খাবারের তো এখনও তেমন অভাব আমাদের নেই। শুধু আমাদের বেঁচে থাকতে হবে আর লক্ষ্য রাখতে হবে ওদের ওপর। জানতে হবে ওদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে।'

লোকটার আত্মবিশ্বাসে মুগ্ধ আমি। 'বাহ্, বাহ্!' উৎসাহ দিলাম ওকে। 'বলে যাও, হে।'

'আমরা যারা মঙ্গলবাসীদের হাত থেকে বেঁচে যাব তাদেরকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে কিভাবে নিজেদেরকে নিরাপদে রক্ষা করা যায় সে ব্যাপারে। কোন দুর্বল কিংবা ভীতু মানুষকে আমাদের দলে নেব

না। আমরা আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যাব। লণ্ডনের রাস্তায় মাটির নিচে মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে আছে ড্রেন আর রেলওয়ে টানেল। ওখানে আস্তানা গাড়ব।'

'এ স্রেফ ইঁদুরের মত বেঁচে থাকা।' গুঙিয়ে উঠলাম আমি।

'কিন্তু ওভাবেই আমাদের বাঁচতে হবে। মাটির নিচে আমরা নিরাপদে থাকব। আর ফাঁক পেলেই মঙ্গলবাসীদের ওপর লক্ষ রাখব। জেনে নেব কিভাবে ওরা ফাইটিং মেশিনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, তাপরশ্মি ব্যবহারের প্রক্রিয়াই বা কি। আর এসব জানতে পারলে অতর্কিতে আক্রমণ করে মার্শিয়ানদের সমস্ত শক্তি আমরা নষ্ট করে দেব। আবার পৃথিবীর বুকে মানুষের প্রভুত্ব কায়েম হবে।'

সৈনিকের পরিকল্পনা বেশ পছন্দ হলো আমার। আরও অনেকক্ষণ কথা বললাম আমরা এই বিষয় নিয়ে। আকাশ পথে মার্শিয়ানরা এলে আমাদের দেখে ফেলতে পারে ভেবে দ্রুত চলে এলাম পাটনি হিলে, সৈনিকের গুপ্ত আস্তানায়।

সৈনিক আমাকে কচ্ছপের সুপ আর ওয়াইন খেতে দিল। এগুলো ভাঁড়ার ঘরে পেয়েছে সে। খেতে খেতে প্ল্যান করলাম কিভাবে একটা ফাইটিং-মেশিনকে কব্জা করা যায়, সে ব্যাপারে।

সন্ধ্যার সময় আমি বাড়ির ছাদে গেলাম। চারদিকে তাকাতে তাকাতে অপরাধবোধে ভারী হয়ে উঠল মন। নিজেকে বিশ্বাস ঘাতক বলে মনে হতে লাগল। জানি না আমার স্ত্রী কি অবস্থায় আছে, জানি না আর সবার কি অবস্থা। সবাই যেখানে অনাহারে, না খেতে পেয়ে মারা যাচ্ছে সেখানে কিনা আমি কচ্ছপের সুপ আর মদ গিলছি, নাহ্, আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। সৈনিক থাকুক তার স্বপ্ন নিয়ে। আমি লণ্ডন চলে যাব। খুঁজে বের করার চেষ্টা করব আমার হারিয়ে যাওয়া স্বজন, বন্ধুবান্ধব। লণ্ডনে গিয়ে আমি কাছ থেকে দেখার চেষ্টা করব মঙ্গলবাসীদের, জানব ওদের দুর্বলতা কি, কোথায়। তারপর সুযোগ পেলে হানব মরণ আঘাত।

সতেরো

সৈনিককে কিছু না জানিয়ে পরদিনই চলে এলাম ওর আস্তানা ছেড়ে। ফুলহ্যাম শহরের কাছে এসে দেখলাম রাস্তাঘাট সব কালো ধুলোতে বোঝাই। দোকানপাট ভাঙা, ভয় জাগানো নৈঃশব্দ চারদিকে। খাবারও জোগাড় হলো একটা বেকারী থেকে। কিন্তু নষ্ট। তবু কষ্ট করে তাই গলাধঃকরণ করতে হলো। রাস্তায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা অসংখ্য লাশ ডিঙিয়ে পথ চলতে লাগলাম আমি। কালো ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে এরাও, কিন্তু গন্ধে বুঝলাম অনেকদিন আগে মারা গেছে হতভাগ্য লোকগুলো।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পৌঁছে গেলাম লণ্ডনের দ্বারপ্রান্তে। এখানেও সেই একই মর্মান্তিক দৃশ্য। ছড়িয়ে আছে কালো ধূসরিত মানুষের অগণিত লাশ। হঠাৎ কানে এল গোঙানির আওয়াজ। যেন কেউ প্রবল যন্ত্রণায় কেঁদে চলেছে 'উল্লা, উল্লা, উল্লা, উল্লা' শব্দ করে। উত্তর দিকে যত এগোলাম কান্নার আওয়াজ তত স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বীভৎস এই গোঙানিতে গায়ে কাঁটা দিল আমার। 'এই মৃত নগরীতে একা আমি কেন ঘুরে মরছি?' নিজেকে প্রশ্ন করলাম। অসম্ভব একা মনে হলো এই জনমানবশূন্য প্রান্তরে, দ্রুত পা বাড়ালাম সামনে।

অক্সফোর্ড স্ট্রীট হয়ে লণ্ডনে ঢুকলাম আমি। এখানেও সেই কালো ধুলোয় মোড়া লাশের ছড়াছড়ি। রাস্তাঘাট আশ্চর্য নীরব, ঘরবাড়িগুলো যেন হানাবাড়ি। রিজেন্ট পার্কের দিকে এগোলাম আমি। পার্কে ঢুকতেই চোখে পড়ল ওটাকে। বেশ দূরে গাছ-পালার মাথা ছাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক ফাইটিং-মেশিন। ওটার মাথা বা হুড থেকে ভেসে আসছে বিশ্রী গোঙানির আওয়াজ।

অবাক ব্যাপার কিলিং মেশিনটাকে দেখে ভয় পেলাম না আমি। হয়তো ভয় পেতে পেতে ভয় পাবার নার্ভগুলো তাদের কার্যকারিতা হারিয়েছে। আমি শান্তভাবে এগিয়ে গেলাম ওটার দিকে, লক্ষ করতে থাকলাম। কিন্তু নড়ল না যন্ত্রদানব। দাঁড়িয়ে একভাবে গুঙিয়ে যেতে লাগল। 'উল্লা, উল্লা, উল্লা' শব্দটা আমাকে বিভ্রান্ত করে তুললেও

ব্যাপারটা কি জানার বেশ আগ্রহ হলো। তবে আরও কাছে যেতে সাহসে কুলাল না। ভয় ভয় অনুভূতিটা আবার ফিরে এসেছে মনে। তাই বেরিয়ে এলাম পার্ক থেকে। রাস্তা দিয়ে, ভাঙা বাড়িঘরের চত্বর পেরিয়ে জোরে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ কুকুরের ডাক কানে এল। পরক্ষণে দেখলাম একটা কুকুর ছুটতে ছুটতে আসছে, চোয়ালের ফাঁকে লাল একটুকরো মাংস, তার পেছনে আরও কতগুলো নেড়ি। ধাওয়া করেছে প্রথমটাকে। মাংসের লোভে, সন্দেহ নেই। আমার দিকে ফিরেও দেখল না, পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল। পরক্ষণে সেই জান্তব 'উল্লা, উল্লা, উল্লা' শুরু হলো।

কিছুদূর এগোতে আরেকটা ফাইটিং-মেশিনকে চোখে পড়ল। হাঁটু ভাঙা 'দ' হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়। শুঁড়গুলো বেঁকে গেছে, শরীরের সামনের অংশ ছিন্নভিন্ন। হয়তো অন্ধভাবে চলতে গিয়ে কোন দালানের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে এই অবস্থা হয়েছে, অনুমান করলাম। তাহলে কি মঙ্গলবাসী তার মেশিনের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে?

ফাইটিং-মেশিনটাকে ভাল করে দেখার জন্য একটা ভাঙা বাড়ির ছাদে উঠলাম আমি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তবু আবছা আলোয় যা দেখলাম তাতে গা শিরশির করে উঠল। প্রতিটি ফাইটিং-মেশিনের হুডের মধ্যে একটি করে মঙ্গলবাসী আত্ম গোপন করে থাকে, তারাই যন্ত্রটাকে চালায়—এ কথা আগেই বলেছি। এই ফাইটিং-মেশিনের চালককে হুডের ভেতরে দেখলাম না আমি। বদলে কালচে রক্ত আর আধ-খাওয়া একটা শরীর নজরে এল। বুঝতে পারলাম কুকুরটা কোথায় কাঁচা মাংস পেয়েছিল।

দৃশ্যটা এত বীভৎস যে দ্বিতীয়বার আর ওদিকে তাকাতে ইচ্ছে করল না। তাড়াতাড়ি ওখান থেকে কেটে পড়লাম। খানিক দূর যেতে, গাছপালার ফাঁকে আরও একটা ফাইটিং-মেশিনকে দেখতে পেলাম, চিড়িয়াখানার কাছের পার্কে স্থির দাঁড়িয়ে রয়েছে। ওদিকে আর যেতে সাহস হলো না। ফিরতি পথ ধরলাম।

ঘুরতে ঘুরতে মাঝরাত হয়ে গেল। রাত কাটাবার মত একটা জায়গা খুঁজছি। শেষমেষ একটা ক্যাব-এ আশ্রয় মিলল।

ভোরের আলোয় ভয় অনেকটাই কেটে গেল। রিজেন্টস পার্কের অবস্থা দেখতে যাব ঠিক করলাম। একটা পাহাড়ের মাথায় আরেকটা

ফাইটিং-মেশিনকে দেখলাম খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, প্রাণের কোন স্পন্দন নেই। হুড ঘিরে কতগুলো শকুনের ঝাঁক। কি যেন খাচ্ছে।

কৌতূহল হলো খুব। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম পাহাড়ে। ভুল দেখছি না তো? ক্ষুধার্ত পাখিগুলো মৃত মঙ্গলবাসীর মগজ খাচ্ছে খুঁটে খুঁটে।

পাহাড়টার চুড়োয় মাটির বেশ কয়েকটা উঁচু ঢিবি। একটা ঢিবিতে উঠে তাকালাম নিচে। একটা বিরাট গর্ত। এত বড় গর্ত জীবনে দেখিনি আমি। গর্তের মধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশটা মঙ্গলবাসী—এক কাতারে পড়ে আছে চিৎ হয়ে। মৃত।

ওদের মৃত্যুর কারণ তখন বুঝতে না পারলেও পরে জেনেছি ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে মারা পড়েছে সবাই। মানুষ তার সর্বশক্তি দিয়ে যা পারেনি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবাণুগুলো তাই সম্ভব করে ছেড়েছে।

কিন্তু কিভাবে সম্ভব হলো এটা? অপ্রতিরোধ্য এবং অজেয় বলে যাদের মনে হয়েছিল তারা ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে কিভাবে মারা গেল? ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন বিজ্ঞানীরা— মানুষ ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ-শোকের চিকিৎসা আবিষ্কার করলেও মঙ্গলবাসীরা এ ব্যাপারটা সম্পর্কে সম্পূর্ণই অজ্ঞ ছিল। এর কারণ একটাই হতে পারে—তাদের গ্রহে কোনও ব্যাকটেরিয়া নেই। আর তাদের শারীরিক গঠন, পরে পরীক্ষা করে জেনেছেন বিজ্ঞানীরা, এমনই যে ব্যাকটেরিয়া ঠেকাবার প্রতিরোধ ক্ষমতাও ছিল না দেহে। তারা আমাদের গ্রহের পানি পান করেছে, আমাদের খাবার খেয়েছে আর সেই সঙ্গে শরীরে টেনে নিয়েছে তাদের যমদূত ব্যাকটেরিয়াকে। আমাদের শরীরে ব্যাকটেরিয়া প্রতিরোধক কোষ থাকলেও মঙ্গলবাসীদের তা নেই। তাই কোটি কোটি ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণে তারা সবাই প্রাণ হারিয়েছে।

অশুভ মঙ্গলবাসীদের কবল থেকে শস্য-শ্যামল এই পৃথিবী এখন মুক্ত ভাবতেই চোখে জল এসে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে আরও অসংখ্য ফাইটিং-মেশিন চোখে পড়ল। সবগুলো নিশ্চল, নিথর। ওদের প্রভুদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সব ক'টা পরিণত হয়েছে বাতিল ধাতব জঞ্জালে।

কিছু মানুষ নিশ্চই এখনও এই বিরাট নগরীতে বেঁচে আছে, আবার আশায় বুক বাঁধলাম আমি, আবার নিশ্চই নতুন করে জীবন শুরু করা

যাবে। দু'হাত তুলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালাম। 'ধন্যবাদ, ঈশ্বর, ধন্যবাদ তোমাকে,' ফিসফিস করে বললাম আমি। টের পেলাম জলের ধারা গড়িয়ে পড়ছে দু'গাল বেয়ে। 'যারা এখনও বেঁচে আছে তাদের জন্য তোমাকে হাজারও ধন্যবাদ। আবার আমরা সব কিছু নতুন করে গড়ে তুলব। সে শক্তি তুমি আমাদের দিয়ো দয়াময়।'

আঠারো

আমার গল্পের প্রায় শেষ অংশে চলে এসেছি আমি। কিন্তু এটা হলো সবচেয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যা যা আমার জীবনে ঘটেছে এতক্ষণ হুবহু তাই বর্ণনা করেছি···কিন্তু পাহাড়ের চুড়োয় দাঁড়িয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়ার পর মুহূর্তে জ্ঞান হারাই আমি। পরবর্তী তিনটি দিনের কথা কিছুই মনে নেই আমার। লোকমুখে যা শুনেছি তাই এবার বর্ণনা করতে যাচ্ছি।

হিংস্র মঙ্গলবাসীদের নির্মম হামলার হাত থেকে আমি ছাড়াও আরও বেশ ক'জন অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল। এদের মধ্যে একজন আমারই মত আবিষ্কার করে বসে মার্শিয়ানদের শেষ পরিণতি। ওই লোকটি সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়ে খবরটা তার করে দেয় প্যারিসে। প্যারিস থেকে খবরটা ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে। আনন্দের ঢেউ বয়ে যায় সর্বত্র। কারণ হাজার হাজার নগরীর কোটি কোটি মানুষ ভয়ানক আতঙ্কে ছিল কখন না জানি মঙ্গলবাসীদের রুদ্ররোষ নেমে আসে তাদের ওপর। অশুভ চক্রের হাত থেকে মুক্ত জেনে সবাই বিহ্বল হয়ে ওঠে খুশিতে। গির্জার ঘণ্টা বেজে ওঠে, মানুষ রাস্তায় নেমে উল্লাস করতে থাকে, বিভিন্ন দেশ থেকে লণ্ডনবাসীদের জন্য খাদ্য সাহায্য আসতে শুরু করে বিপুল পরিমাণে।

এসব ঘটনার কিছুই আমার মনে নেই। কারণ একের পর এক মানসিক আঘাতে স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলি আমি। উদ্‌ভ্রান্তের মত পথে পথে ঘুরছিলাম। ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ানোর তৃতীয় দিনে কয়েকজন লোক আমাকে দেখতে পায় একটা রাস্তার ধারে। বসে কাঁদছি আর গুনগুন করে গান গাইছি। লোকগুলো নিজেদের সমস্যার মধ্যেও

আমাকে তাদের বাড়িতে আশ্রয় দেয়। তাদের সেবা-শুশ্রূষায় আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠি আমি। তারপর একদিন লেদারহেডের কোন খবর তারা জানে কিনা জিজ্ঞেস করলে একজন মুখ করুণ করে বলল, ওই গ্রামটাও মঙ্গলবাসীদের তাণ্ডবলীলা থেকে রক্ষা পায়নি। ওখানে এখন একজনও বেঁচে নেই।

পাথর হয়ে থাকলাম আমি অনেকক্ষণ। মেবারি হিল-এ আমার প্রিয়তমার সঙ্গে কাটানো সুখের দিনগুলো ডানায় ভর করে এল স্মৃতির পাতায়। হু হু করে উঠল বুক। সিদ্ধান্ত নিলাম একবার নিজের বাড়িতে যাব। জানি কারও দেখা পাব না। কিন্তু তারপরও একেবারে নিরাশ হতে নিষেধ করল মন।

আমার আশ্রয়দাতারা অনেক নিষেধ করল যেতে। কিন্তু আমার সিদ্ধান্তে আমি অটল। যাবই। কারও বাধা না মেনে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানো মানুষজন আবার ফিরতে শুরু করেছে নিজেদের ঘরে। কিছু কিছু দোকানও খুলেছে। ফ্রান্স থেকে সাহায্য হিসেবে পাওয়া রুটি ক্ষুধার্ত লোকজনের মধ্যে বিতরণ করে চলেছে গির্জাগুলো। নোংরা পোশাক, পাণ্ডুর মুখেও সবার মধ্যে কি ব্যস্ততা! একটার পর একটা ট্রেন আসছে যাচ্ছে হাজার হাজার যাত্রী নিয়ে। সবাই বাড়ি ফিরছে। আমি টিকেট কেটে একটা কমপার্টমেন্টে উঠে পড়লাম। জানালা দিয়ে তাকালাম বাইরে। মাইলের পর মাইল শুধু ধ্বংসের চিহ্ন। এক জায়গায় দেখলাম রেল-কর্মীরা উপড়ে ফেলা রেললাইন আবার মেরামতের কাজে ব্যস্ত। সাময়িক ধাক্কাটা অনেকেই সামলে উঠতে পেরেছে। এটা নিঃসন্দেহে একটা শুভ লক্ষণ।

বাইফ্লিট স্টেশনে নেমে পড়লাম আমি। কারণ ওকিং-এর রেললাইনে এখনও মেরামতী কাজ চলছে। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে সোজা মেবারি-র দিকে হাঁটা শুরু করলাম। মঙ্গলবাসীরা প্রথম যেখানে ল্যাণ্ড করেছিল সেই বিরাট গর্তটা পেরিয়ে গেলাম। লেদারহেড থেকে ফেরার পথে আমার ঘোড়ার গাড়িটা যেখানে উল্টে গিয়েছিল সেখানেও কিছুক্ষণের জন্য থামলাম, গাড়িটা ভাঙা অবস্থায় এখনও আগের জায়গায় পড়ে আছে, পাশে চতুষ্পদী প্রাণীটার সাদা কঙ্কাল…

বাড়ির সামনে এসে খুবই মুষড়ে পড়লাম আমি। যে আশা নিয়ে

এসেছিলাম সব নিভে গেল দপ করে। দরজাটা ভাঙা, বাতাসে দোল খাচ্ছে। স্টাডিরুমের পর্দাগুলো অদৃশ্য, জানালার কাঁচেরও কোন খবর নেই। সিঁড়ি বেয়ে স্টাডি রুমে চলে এলাম। একটা আর্টিকেল পড়ে আছে এখনও টেবিলের ওপর। ভারী পেপারওয়েট দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম বলেই হয়তো উড়ে যায়নি। মার্শিয়ানরা প্রথম যেদিন ল্যাণ্ড করে সেদিন আমি আর্টিকেলটা শুরু করি। ভবিষ্যতে মানব সভ্যতা কতদূর সমৃদ্ধ হতে পারবে তার ওপর একটা লেখা। কিন্তু অসম্পূর্ণ। কারণ শুরু করার পরেই আমি হকারের কাছ থেকে খবরের কাগজ আনতে যাই। ওইদিনের কাগজেই মঙ্গলবাসীদের খবর বেরোয়। তারপর আর লেখার সময় পেলাম কোথায়। সব কিছুই তো আকস্মিক লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

ডাইনিং রুমে নেমে এলাম আমি, টেবিলের ওপর মাংস আর রুটি ছড়ানো। পচে গেছে। বিয়ারের একটা বোতল উল্টে আছে। মনে পড়ল খাবার শেষ না করেই তাড়াহুড়ো করে সৈনিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম আমি।

বাড়িটাকে মনে হলো সভ্য জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মনের ভেতর যে বাসনা লালন করে রেখেছিলাম এতদিন— সহধর্মিণীর দেখা পাব—সব আশা ফুরিয়ে গেল।

হতাশ আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার কথা ভাবছি, হঠাৎ অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটল। শুনতে পেলাম সামনের দরজায় কে যেন কথা বলছে!

'তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম,' পুরুষ কণ্ঠটি বলল, 'কোন লাভ হবে না। বাড়িটা এখন পোড়োবাড়ি। বহুদিন ধরে কেউ এখানে থাকে না। এখানে শুধু শুধু থেকে কেন কষ্ট পাবে। প্যারিস থেকে এত কষ্ট করে এজন্যই তোমাকে আসতে নিষেধ করেছিলাম আমি।'

একটা ধাক্কা খেলাম আমি। কে আমার আশায় এখানে সুদূর প্যারিস থেকে এসেছে? কে জানে আমি এখানে আছি? তবে কি···তবে কি···

বিদ্যুৎগতিতে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি, বেরিয়ে এলাম ডাইনিং রুম থেকে। বাগানের সঙ্গে লাগোয়া ফ্রেঞ্চডোরটা খুলতেই টলমল করে উঠল বুক। সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমার কাজিন···সঙ্গে আমার স্ত্রী। ওর মুখটা সাদা, কিন্তু আমাকে দেখেই চিৎকার দিল।

'আমি এসেছিলাম,' বিড়বিড় করে বলল ও। 'আমি জানতাম···আমি জানতাম···' গলা চেপে ধরল সে, টলে উঠল।

ঝড়ের বেগে ছুটে গেলাম আমি, জ্ঞান হারাবার আগেই ওকে জড়িয়ে ধরলাম দুই হাতে।

উনিশ

পরে শুনেছি আমার স্ত্রীকে আমার কাজিন আগেভাগেই প্যারিসে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে প্রাণে বেঁচে যায় ওরা। আর আমার ভাই ফ্রাঙ্কও সুস্থ শরীরে লণ্ডনে ফিরেছে। এক পার্টিতে আনন্দ-উল্লাসের মধ্যে আমরা সবাই মিলিত হলাম।

মঙ্গলবাসীদের আক্রমণের ধাক্কা আমরা ক্রমে সামলেও উঠলাম। ওদের মৃত্যুর কারণ জানতে পারলেও তাপ-রশ্মি কিংবা কালো ধোঁয়ার রহস্য কেউ জানতে পারেনি।

তবে মঙ্গল থেকে আরেকটা হামলার আশঙ্কা একেবারে ফেলে দিতে পারল না বিশ্ববাসী। অন্তত আমি এ ব্যাপারটা বিশ্বাস করি। তাই আমার মতে এজন্য আমাদের আগে ভাগে প্রস্তুত থাকা দরকার। কারণ অন্তত এটা তো জানি যে ওরা মঙ্গল থেকে সিলিণ্ডার ছুঁড়বে। এই সিলিণ্ডার ধ্বংস করা যেতে পারে পূর্ণ প্রস্তুতি থাকলেই। তবে মঙ্গলবাসীরা ভবিষ্যতে যদি হামলা করেও, একই পদ্ধতিতে আক্রমণ চালাবে কিনা সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। অবশ্য একেবারে হামলা না করার সম্ভাবনাও আছে তাদের পূর্বসূরিদের নিয়তির কথা ভেবে। হয়তো তারা অন্য কোন গ্রহে পরবর্তী অভিযান চালাতে পারে। তবে অনেক জ্যোতির্বিদ মনে করেন মঙ্গলবাসীরা এখন শুক্র গ্রহে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে। সে যা-ই হোক, একটা ব্যাপারে আমাদের অন্তত শিক্ষা হয়ে গেছে যে, যতই বড়াই করি না কেন গ্রহান্তরের অধিবাসীদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সবুজ এই গ্রহ সম্পূর্ণ নিরাপদ কিন্তু নয়।

তবে একটা কথা আমি আর আমার স্ত্রী প্রায়ই ভাবি। বিশেষ করে নক্ষত্রের রাতগুলোতে, যখন ছাদে বসে একান্তে দু'জনে দু'জনার হই,

সেইসব দুর্লভ মুহূর্তগুলোতে।

ভাবি জ্যোতির্বিদদের কথা যদি সত্যি হয়, মঙ্গলবাসীরা শুক্রগ্রহে তাদের আস্তানা গাড়তে পারে, তাহলে আমরা কেন পারব না। চেষ্টা করলে মানুষ নিশ্চই অন্য গ্রহে গিয়ে বসবাস করতে পারবে। কে জানে সেদিন হয়তো খুব বেশি দূরে নয় যখন নিজেদের প্রয়োজনে মানুষ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও খুঁজে নেবে তার নতুন ঠিকানা।

***